– পঞ্চম অধ্যায় –

কৃষকের জীবনের শরিক যে জন ঃ বিশেষ পাঠ।

‘বর্গক্ষেত্র’, ‘হলুদ রঙের সূর্য’, ‘মেঘের নদী’।

পঞ্চম অধ্যায়

কৃষকের জীবনের শরিক যে জন ঃ বিশেষ পাঠ।
‘বর্গক্ষেত্র’, ‘হলুদ রঙের সূর্য’, ‘ মেঘের নদী’।

অভিজিৎ সেনের রচনার প্রধান অবলম্বন হলো গ্রাম। আর গ্রামীণ অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্য কৃষিকেন্দ্রিকতা। তাই লেখকের গল্প উপন্যাসের মধ্যেও প্রধানত সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার কৃষিকৃন্দ্রিক জীবনের বাস্তব অবস্থা, কৃষিজীবী মানুষ বা কৃষি শ্রমিকদের নানাভাবে নিগৃহীত হওয়ার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। আলাদা করে অভিজিৎ সেনের কয়েকটি উপন্যাসকে কৃষিকেন্দ্রিক উপন্যাস বলা কষ্টকর। তবুও গবেষণার স্বার্থে আমরা উপন্যাসের মূল theme বা বিষয়ের উপর ভিত্তি করে কিছু বিভাজন করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এই বিভাজন নিতান্তই কৃত্রিম। কেননা অভিজিৎ সেনের সমস্ত রচনাই কম বেশি কৃষি জীবন, কৃষক জীবন এবং যে শোষণ-শৃঙ্খলা কৃষকের জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছে - তারই উন্মোচনের আখ্যান।

কৃষকদের জীবন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘রাশিয়ার চিঠি’ তে লিখেছেন -

“সবচেয়ে কম খেয়ে, কম প’রে, কম শিখে, বাকি সকলের পরিচর্যা করে; সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা রোগে মরে, উপোসে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি ঝাঁটা মার - জীবন যাত্রার জন্য যতকিছু সুযোগ সুবিধে সবকিছুর থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে - উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।”[১]

রাজা মহারাজা নবাব বাদশাহদের মহান কীর্তিতে মহিমান্বিত ভারতের ইতিহাসের অধিকাংশ কীর্তির পেছনে ক্রিয়াশীল কৃষককুলের অবদানের ইতিহাস বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অনালোচিত আমাদের ইতিহাসচর্চায়। যাদের রক্তে ঘামে এই সভ্যতা পরিপুষ্ট সমাজে

তারাই সবচেয়ে অবহেলিত, সবচেয়ে নিপীড়িত, সবচেয়ে বঞ্চিত। আমাদের দেশের কৃষকসমাজের এই সীমাহীন দুর্দশার জন্য দায়ী - যুগ যুগ ধরে জগদ্দল পাথরের মতো তাদের বুকে চেপে বসে থাকা ভারতীয় সামন্ততন্ত্র। জমির সামন্ততান্ত্রিক মালিকানা তথা উৎপাদন ও বিনিময়ের সামন্ততান্ত্রিক ধরনই আমাদের প্রচলিত অর্থনৈতিক ভিত্তি যার উপর ভিত্তি করে কৃষকের রক্ত চুষে তার জরাজীর্ণ জীবনকে হাতিয়ার বানিয়ে বীরদর্পে আস্ফালন করছে আধিপত্যবাদী শোষক সমাজ। ভারতবর্ষের মত দেশে যেখানে উৎপাদনের মূল নিয়ন্তাই হলো কৃষক, সেখান কৃষকদের এই করুণ অবস্থা সত্যই মর্মান্তিক।

অভিজিৎ সেনের সমস্ত রচনাই মোটামুটিভাবে এই সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। একদিকে বর্গা ব্যবস্থা, ভূমি সংস্কার, অন্যদিকে বর্গাকে কেন্দ্র করে নতুন আধিপত্যের বিকাশ আবার অন্যদিকে কৃষি ক্ষেত্রে নানান এন.জি.ওর অনুপ্রবেশ, কৃষি জমির ভাগ তথা মালিকানার নতুন কাঠামো গঠন - এ সবই লেখকের রচনায় নানাভাবে স্থান পেয়েছে। তার প্রায় সবগুলি উপন্যাসেরই বয়ানে রয়েছে প্রতাপের শোষণের বিরুদ্ধে ঔপন্যাসিকের প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদের বয়ান কখনো প্রত্যক্ষ, আবার কখনো পরোক্ষ। যেহেতু লেখকের জীবনের বেশির ভাগ সময়ই গ্রাম ও উপনগরে যাপিত হয়েছে ফলে গ্রামের কৃষকদের জীবনচর্যার নানা বৈচিত্রময় দিক, তাদের নানবিধ বাস্তব সমস্যাও তিনি খুব কাছ থেকে লক্ষ্য করার সুযোগ পেয়েছেন এবং একজন দায়িত্বশীল কথাকার হিসেবে বিষয়গুলিকে সাহিত্যের উপাদান করে তুলে আনার চেষ্টাও করেছেন।

কৃষকদের জীবনকে গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ ইত্যাদিতে এর পূর্বে এবং পরে আরও নানা সাহিত্যকার নানা ভাবে ব্যবহার করেছেন। তুলে ধরেছেন। ভারতবর্ষ নামের এই দেশটিতে যেখানে প্রায় ৭৫% লোক কৃষির সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জড়িত, যেখানে সাহিত্যে যে 'কৃষি' ব্যাপারটি একটি বিশেষ জায়গা পাবে, এতে দ্বিমত নেই, কিন্তু যে কৃষির উপর দেশের সিংহভাগ মানুষ আর দেশের অর্থনীতি অনেকটাই নির্ভরশীল সেই কৃষি যারা করে, সেই কৃষকদের বাস্তব অবস্থা সাহিত্যে, আমাদের বাংলা সাহিত্যে কখনই খুব

দরদের সঙ্গে, পরিবেশিত হয় নি। তাদের সামাজিক অবস্থার দৈনতা চোখে পড়েছে, কিন্তু তাদের বাস্তব সমস্যাদির যথাযথ বর্ণনা বা যথার্থ প্রতিলিপি চিত্রিত হয় নি। অভিজিৎ সেন, দেবেশ রায় প্রমুখেরা সামন্ততন্ত্রে জীর্ণ কৃষক সমাজকে বিশ শতকের বর্গা আন্দোলন, তেভাগা, জমি মালিকানা ও ভাগীচাষ ইত্যাদির আলোকে নতুনভাবে দেখার চেষ্টা করলেন। যেহেতু তাঁদের রাজনৈতিক বিষয়ে জ্ঞান উৎসাহ এবং অংশগ্রহণ ছিল তাই প্রত্যেকেই এই বিষয়গুলির ব্যাখ্যানে নানান রাজনৈতিক টানাপোড়েনের চিত্রও পাশাপাশি স্থান পেয়েছে। তবে কৃষকদের বাস্তবিক সমস্যাগুলির বর্ণনের পাশে তা কখনই অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। আধিপত্যবাদের শোষণ যেহেতু এই সত্তরের দশকের লেখকদের রচনার একটি বিশেষ আধেয়, তাই কৃষক সমাজের উপর সামন্ততন্ত্রের প্রভাব ও শোষণের আখ্যান তাদের রচনায় খুব স্বাভাবিক ভাবেই উঠে এসেছে।

কৃষকদের জীবন নিয়ে এর আগেও বহু লেখক বহুবিধ ব্যাখ্যা করেছেন, যাদের মধ্যে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিবিধ প্রবন্ধ' এর অন্তর্গত 'বঙ্গদেশে কৃষক', শীর্ষক প্রবন্ধের চারটি অধ্যায়ে লেখকের কৃষকজীবন সম্বন্ধে চিন্তাচেতনার ব্যাখ্যানটি একটু বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। বাংলার কৃষক বাংলার প্রাণ; বাংলাকে ভরণপোষণের দায়িত্ব তারই। বঙ্কিমের ভাষায় ঃ

"এই কৃষিজীবী কয় জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশের কয় জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ- দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী।"[২]

অর্থাৎ কৃষকই এই দেশের নিয়ন্তা, উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে তাদের সরাসরি যোগাযোগ। কিন্তু উৎপাদনের পরিমানের উপর তাদের অধিকার সম্পূর্ণ নয়, নয় এর থেকে পাওয়া অর্থনৈতিক লাভের উপরও। তাদের অবস্থার বর্ণনা লেখক করেছেন এই ভাবে-

"দুই প্রহরের রৌদ্রে, খালি মাথায়, খালি পায়ে, এক হাঁটু কাঁদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্ম্ম বিশিষ্ট বলদে, ভোতা- হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে, উহাদের কি মঙ্গল

হইয়াছে? উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষায় ছাতি-ফাটিয়া যাইতেছে, তাহার নিবারণ জন্য অঞ্জলি করিয়া মাঠের কর্দ্দম পান করিতেছে, ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, কিন্তু এখন বাড়ী গিয়া আহার করা হইবে না, এই চাষের সময়। সন্ধ্যাবেলা গিয়া উহারা ভাঙ্গা পাতরে রাঙ্গা রাঙ্গা বড় বড় ভাত, লুন, লঙ্কা, দিয়া আধপেটা খাইবে। তাহার পর ছেঁড়া মাদুরে, না হয় ভূসে, গোহালের এক পাশে শয়ন করিবে- উহাদের মশা লাগে না। তাহারা পরদিন প্রাতে আবার সেই এক হাঁটু কাদায় কাজ করিতে যাইবে- যাইবার সময় হয় জমীদার, নয় মহাজন, পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া দেনার জন্য বসাইয়া রাখিবে, কাজ হইবে না। নয়ত চষিবার সময় জমীদার জমীখানি কাড়িয়া লইবেন, তাহা হইলে সে বৎসর কি করিবে? উপবাস - সপরিবারে উপবাস।''[৩]

কৃষকদের এই উপবাসের মূল্যে জমিদার জায়গিরদাররা স্ফীতকার হয়েছে, আধিপত্যবাদীরা একাধিপত্য হাসিল করেছে। এই সামন্ততন্ত্রকে রক্ষাস্তম্ভ বানিয়েই ব্রিটিশেরা দেশকে লুণ্ঠন করেছে, নির্মাণ করেছে নিজেদের সভ্যতার সৌধ। সামাজিক ভিত্তি হিসেবে সামন্ততন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে পারলেই এদেশে শোষণ অব্যাহত রাখা যাবে- এই বেদবাক্য কখনই বিস্মৃত হয় নি আধিপত্যবাদী সমাজ। তাই আরও শাণিত হয়েছে তাদের শোষণের অস্ত্র যার আঘাতের প্রধান জায়গায়ই হলো কৃষককুল। কৃষকেরাও বিরোধিতা করেছে, নানা সময়ে নানা কৃষক বিদ্রোহ, আন্দোলন সামনে এসেছে, কিন্তু বেশীদূর এগোতে পারেনি। কারণ কৃষক বিদ্রোহ অবদমিত ও প্রশমিত করে সামন্ততন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের পাশাপাশি বারবার সামনে এসেছে সংস্কারের সরকারি পদক্ষেপ। এই সরকারি পদক্ষেপ সমূহ কৃষকস্বার্থে গৃহীত বলেই আপাত ভাবে মনে হলেও ধীরে ধীরে তা আধিপত্যবাদেরই তৈরি কৃষক সমাজের বোধগম্যতার অতীত এক জটিল গ্রন্থির রূপ নিয়েছে।

ব্রিটিশদের তৈরি নয়া ভূমি - রাজস্ব ব্যবস্থায় যে বিভিন্ন স্তরের ভূমিস্বত্বের সৃষ্টি হয়েছিল তাদের অধিকারীরাই ছিল ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শোষণের প্রধান রক্ষাস্তম্ভ।

নয়া জমিদারি প্রথাই রচনা করেছিল এদেশে ঔপনিবেশিক শাসনের সামাজিক ভিত্তি। স্বাধীনতা উত্তর কালে, বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে জমিদারি অধিগ্রহণ আইন মারফৎ খাজনাভোগী মধ্যশ্রেণির বিলোপ ঘটানো হলো, তাও আধা-সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের কোনও মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হল না। বরং বিরাট অঙ্কের ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে জমিদাররা জোতদারে পরিণত হলো, আর জমিদারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো রাষ্ট্র স্বয়ং। এক সময়ে যারা জমিদার বিরোধী ও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল, কালক্রমে তারাই সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-শাসনের অন্যতম প্রতিভূ হয়ে ওঠে। জোতদারদের জমিদার বিরোধিতার অর্থ এই নয় যে, তারা সামন্ততন্ত্র বিরোধী ছিল। একইভাবে ব্রিটিশ বিরোধিতার অর্থ এই নয় যে, তারা সাম্রাজ্যবাদী অবস্থানের বিরোধী ছিল। বরং জমিদারদের মত অনপেক্ষ ভূমিখাজনা হিসাবে কৃষকের উদ্বৃত্ত শ্রম আত্মসাৎ করে উত্তর ঔপনিবেশিক ভারতরাষ্ট্র নিজেই হয়ে উঠেছিল 'জমিদার'।

ঔপনিবেশিক এমনকি উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র একদিকে যেমন দমন পীড়ন চালিয়ে বিভিন্ন কৃষকবিদ্রোহকে অবদমিত করেছে, অন্যদিকে কিছু আইন প্রণয়ন করে কিংবা প্রণীত আইন 'সংশোধিত' করে অসহনীয় সামন্ততন্ত্রের গায়ে সংস্কারের প্রলেপ মাখিয়ে নিপীড়িত কৃষকদের কাছে তাকে সহনীয় করে তোলার প্রয়াস চালিয়েছে। কৃষকবিদ্রোহের ফলস্বরূপ যেমন প্রণীত হয়েছিল বঙ্গীয় খাজনা আইন (১৮৫৯) বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন (১৮৮৫) প্রভৃতির মতো কিছু সংস্কার ধর্মী আইন, বিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন কৃষক আন্দোলনের ফলেই ১৯৩৮ ও ১৯৪০ সালে প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধিত হল এবং ১৯৪৬-৪৮ সালের তেভাগা আন্দোলনের পরই কেবল প্রণীত হল পশ্চিমবঙ্গ বর্গাদারি আইন (১৯৫০)। উত্তর ঔপনিবেশিক ভারতে মোটামুটি পঞ্চাশের দশকেই অধিকাংশ রাজ্যে ভূমিসংস্কার সংক্রান্ত আইনগুলি পাশ হয়েছিল। কিন্তু এইসব আইন কার্যকর করতে সরকার নড়েচড়ে বসল একমাত্র নকশালবাড়ি কৃষক অভ্যুত্থানের পরই। নকশালবাড়ির আগুন নির্বাপিত করার তাগিদেই ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকদের জমির ক্ষুধা যথাসম্ভব মিটিয়ে তাদের লড়াই থেকে

সরিয়ে নিয়ে বিপ্লবীদের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার কৌশল হিসাবে ভূমি সংস্কার কর্মসূচী হাতে নিয়েছিল তৎকালীন সরকার। সমালোচক চিত্তরঞ্জন দাশের ভাষায় -

"নকশালবাড়ির আগুনে সবুজ বিপ্লবকে 'লাল' হয়ে যাওয়া থেকে বিরত করার তাগিদেই রায়তিস্বত্বের নথিভুক্ত করণ ও নিরাপত্তাপ্রদান এবং খাজনা ও সিলিং আইন রূপায়নের নামে সত্তর আশির দশকে চলেছিল ভূমি সংস্কারের এক সর্বভারতীয় প্রহসন।" [৪]

এইসব আইন ও সংস্কার যেহেতু আধা সামন্ততান্ত্রিক ভূমি সম্পর্ককে নিরাপত্তা প্রদানেরই সরকারি পদক্ষেপ মাত্র ছিল, তাই শেষ পর্যন্ত তা কৃষক স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যার সার্থক প্রমাণ আমরা পেয়েছি অভিজিৎ সেনের 'বর্গক্ষেত্র' উপন্যাসটিতে।

লেখক অভিজিৎ সেন আশির দশকের বর্গা বিপ্লবের প্রত্যক্ষ চেহারা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তাঁর 'বর্গক্ষেত্র' উপন্যাসটিতে। বর্গা ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল -

"রায়ত জমির মালিকদের অধীন যে জমি আছে তার ওপর একটা উর্ধ্বসীমা আরোপ করে উদ্বৃত্ত (খাস) জমি অধিগ্রহণ এবং ভূমিহীন ও গরিব কৃষকদের মধ্যে তার বিলি বণ্টন, তৎসহ বর্গানেওয়া জমি থেকে বর্গা চাষীরা যাতে উৎখাত হতে না পারে তার জন্য তাদের কিছু আইন সিদ্ধ অধিকার প্রদান.....।" [৫]

কিন্তু এই ব্যবস্থার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এতটা সরল ছিল না। আত্মস্বার্থ চরিতার্থতার জন্য জমি মালিকেরা অশিক্ষিত, সহজ-সরল চাষিদের নানাভাবে ঠকানোর প্রক্রিয়ায় ছিল অত্যন্ত সক্রিয়। আর এই প্রক্রিয়ারই শিকার উপন্যাসের আস্তিক মাল, পরশুরাম মালেরা। আস্তিক পুরুষানুক্রমে জমি মালিক শচীকান্তের পরিবারের আধিচাষী। তার সঙ্গে জমি মালিকের সাথে তার সম্পর্ক কেবল জমির নয়, - অন্তরের, বিশ্বাসের। এই বিশ্বাসের জোরেই সে বলেছিল -

"হামরা বাবুর চাকর লাগি।" [৬]

যেখানে পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত্তি এতটা গভীর সেখানে কাগজপত্র অবান্তর তার কাছে। আর তাই হয়তো বিশ্বাস ভঙ্গের পরিণামও এতটা ভয়ঙ্কর। শুধু বিশ্বাসভঙ্গের আঘাতে

একটা মানুষের তাৎক্ষণিক মৃত্যু। এই মৃত্যুর প্রেক্ষিতেই উপন্যাসে গড়ে উঠতে দেখি শ্রেণি সংগ্রামের বীজ। ভূমি থেকে কৃষকদের এভাবে উচ্ছেদ এক শ্রেণি সংঘাতের জন্ম নেয়। পরশুরাম ঘোষণা করে -

"জান কবুল, জমি দখল হোবার দিমো না।"[৭]

এই যে 'বাবুর চাকর লাগি' থেকে 'জমির দখল হোবার দিমো না' তে উত্তরণ- এর মাঝেই লুকিয়ে আছে কৃষকের জীবনের নানা প্রেক্ষিত। কাহিনির সূচনা থেকে আলোচনা করলে কয়েকটি বিষয় আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আস্তিক ও তার ভাই বিম্ব মাল বহু বছর ধরে শচীকান্তের দশ একর জমি আধিতে চাষ করে। এতকাল শচীকান্তের সাথে আস্তিকের সম্পর্ক জমিদার ও কৃষককূলের বহুকালীন প্রভু-ভৃত্য জাতীয়ই ছিল। কিন্তু সরকারী আইন অনুসারে জমির রেকর্ডে আধিচাষির নাম অর্ন্তভুক্ত হওয়ার খবর এই সম্পর্ককে একটা নতুন পরিচয় দিল। একবার শচীকান্তের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের গুরুদেবের দীক্ষাদান পর্বে আস্তিক ও শচীকান্তদের গুরুদেবের দীক্ষা লাভ করে। এই ঘটনার পর বহু দিন গত হয়েছে। এর জন্য অস্তিক কোনো বিশেষ মর্যাদা বা সুবিধা কিছুই তার জমিদারের কাছ থেকে এতকাল লাভ করে নি, কিন্তু জমির কাগজে বর্গাচাষির নাম অন্তর্ভুক্তিকরণ-এর খবর এই গুরুভ্রাতার সম্পর্ককে আবার জাগিয়ে দিল। যার প্রমান শচীকান্তের পুত্র বিনয়ের অস্তিকের নিকট প্রেরিত চিঠির বয়ান -

"শ্রদ্ধেয় দাদা,

জয়গুরু জানিবেন। বাবা আগামী ১৭ ফাল্গুন শনিবার বৈকালের মটরে কাশিয়ানি যাইবেন। জমিজমা সংক্রান্ত কিছু কাজকর্ম আছে। আপনি অথবা পরশুরাম যে কেহ একজন ঘোড়া লইয়া মটর রাস্তায় হাজির থাকিবেন। আমরা কেহ সঙ্গে যাইতেছি না। বাবার শরীর বিশেষ ভালো যাইতেছে না, সেই কারণেই এই অগ্রিম সংবাদ প্রদান। আশা করি গুরুকৃপায় কুশলে আছেন। জয়গুরু -

বিনয়।"[৮]

এই চিঠির অভিনবত্বে আস্তিক আবেগে দিশেহারা হয়েছে। অনুভব করতে পারে নি এ আসলে আধিপত্যবাদীর আর্থিক নিশ্চয়তা ও স্বার্থোদ্ধারের এক নয়া কৌশল। শচীকান্ত ও বিনয় আস্তিকের আবেগকে কাজে লাগিয়ে বর্গারেকর্ড থেকে তাদের নাম বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়ায় সক্রিয় হয়। আর শোষিত শ্রেণির প্রতিভূ আস্তিক কিছু বানিয়ে তোলা বয়ানের মোহে শচীকান্তের মত লোককে ঘোড়ায় চড়তে সুবিধে করে দিতে নিচে হাঁটু গেড়ে বসে পিঠ বাড়িয়ে দেয়। লক্ষণীয়ভাবে এখানে ধর্ম বিশ্বাস চমৎকার ভাবে শোষণের ঔষধ হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। তবে ঔপন্যাসিক একে পরি প্রেক্ষিতের ইশারা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করেছেন মাত্র। অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্যের মতে -

"শ্রেণী বিভক্ত সমাজের সাধারণ শোষণ ভিত্তিক বাস্তবতা কিভাবে শাখা - প্রশাখা ছড়িয়ে টিকে থাকে এবং রাষ্ট্রশক্তির দৃশ্য ও অদৃশ্য বহু নানা ধরনের রাজনৈতিক দল, প্রশাসন, ধর্মতন্ত্র, বর্ণ ও শিল্পগত বিন্যাস তাকে বৈধতা দেয় - এই বহুস্বরিক প্রতিবেদন আমরা লক্ষ করি 'বর্গক্ষেত্র' এর মধ্যে''।[৯]

তাই দেখি নিজের পুত্রকে প্রহার করে আস্তিক, জনসমক্ষে ওঠা বিরুদ্ধতার স্বরকে দাবিয়ে দিয়ে আধি রেকর্ডের অফিসারের কাছে আস্তিক ঘোষণা করেঃ

"হামরা বাবুর চাকর লাগি।
চার পুরুষ ধরে চাকর?
অ্যাঁ ? হ্যাঁ, তাই লিখ্যা লন।''[১০]

অভিজিৎ এখানে দেখালেন শ্রেণিবিরোধ ধর্মের টানে কেমন মসৃণ হয়ে যায়। কিন্তু মোহ যখন ভাঙে তখন তার পরিণাম হতে পারে ভয়ঙ্কর। শচীকান্ত যখন তার জমি রাখালকে বিক্রি করে দেয়, তখন যে একান্ত বিশ্বাসে আস্তিক নিজেকে বেঁধে রেখেছিল, ছেলেকে প্রহার করে, বিরোধিতা করে জমির বর্গা নেয়নি, সেই বিশ্বাস চুরমার হয়ে গেছে আর সেই আঘাতে ঐ বিশালকায় আস্তিক তৎক্ষনাৎ পড়ে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে। এখানে শশাঙ্কর সঙ্গে তারাপদর আলোচনাটি বিশেষ তাৎপর্যময়-

"আস্তিক নেই। আস্তিকের মৃত্যু আমার সারাজীবনের সঞ্চয়ের মতো একটা অভিজ্ঞতা। শুধু বিশ্বাসভঙ্গের আঘাতে একটা মানুষের তাৎক্ষণিক মৃত্যু হয়? এরা কোন মাপের মানুষ? এ বুঝি শুধু আমার দেশেই সম্ভব।'' [১১]

যে আস্তিক এক সময় দারোগার অত্যাচারের প্রতিবাদে সবল পদাঘাতে দারোগাকে ধ্বস্ত করেছিল, আবার সেই বিশ্বাসের ও আবেগের তাড়নায় হামাগুড়ি দিয়ে বসে শচীকান্তের ঘোড়ায় ওঠার সিঁড়িও হয়েছিল, আস্তিকের মৃত্যুতে ঐ বিশ্বাসের অবসান ঘটল। এলো শ্রেণি সংগ্রামের যুগ, এলো পরশুরামের যুগ। পরশুরাম সজোরে উচ্চারণ করে প্রাণের বদলেও জমির দখল সে ছাড়বে না। জমি হস্তান্তরের নতুন হিড়িক, পুরোনো চিন্তায় ধৃত বামপন্থী দলগুলোর সঙ্গে যুক্ত মধ্যকৃষক শ্রেণির উদ্ভব, এই পরিপ্রেক্ষিতে পরশুরাম সংগঠিত করে ভূমিহীনদের– সাঁওতাল, ওঁরাও, রাজবংশীদের। ধীরে ধীরে এই শোষিত শ্রেণি ও সমগ্র সরকারি বামপন্থী আমলাতন্ত্র পরস্পর বিপরীতে দাঁড়ায়। এক সশস্ত্র প্রতিরোধে এদের মুখোমুখি হয় পরশুরাম।

অভিজিৎ সেন - এর 'বর্গক্ষেত্র' উপন্যাসটি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ''এ সময়, বাস্তব ঃ সমগ্ররূপ''- শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন -

" 'বর্গক্ষেত্র' উপন্যাসটিতে বাহান্ন পৃষ্ঠার মধ্যে অভিজিৎ সেন আশির দশকের বর্গা-বিপ্লবের বর্গক্ষেত্রটির আসল চেহারা দেখিয়েছেন। পার্টি পঞ্চায়েত, শশাঙ্ক-তারাপদ-মাখন, অন্যদিকে ভূমিহীন, প্রায় ভূমিহীন কৃষিজীবী ঃ শচীকান্ত - অস্তিক ও পরশুরাম, সরকারী ভূমি সংস্কার ও সেটেলমেন্ট বিভাগের কর্মচারী- সব মিলিয়ে এক বর্গক্ষেত্রকে ধরেন অভিজিৎ।'' [১২]

এই বর্গক্ষেত্রের এক অদ্ভুত বিশ্লেষণ লেখক করেছেন তারাপদর বয়ানে। লেখক দেখাছেন বর্গক্ষেত্রের জ্যামিতিক মাপগুলি বর্গাক্ষেত্রের আইনকানুনের সঙ্গে কেমন খাপ খেয়ে যায়-

"বর্গক্ষেত্রের কর্ণগুলির মিলনবিন্দু এবং বাহুগুলির দ্বিখণ্ডকদের মিলনবিন্দু একটিই।

এই বিন্দুটি ভয়ংকরভাবে সম্পূর্ণ ক্ষেত্রটিকে নিয়ন্ত্রণ করে। কেন্দ্রবিন্দু থেকে যে কোন বাহুর মধ্যবিন্দুর দুরত্বকে ব্যাসার্ধ করে একটি বৃত্ত আঁকলে বৃত্তের বাইরে বর্গক্ষেত্রের সামান্য চারটি কৌনিক ভূমি শুধু পরিত্যক্ত থাকে। আবার ব্যাসার্ধটি যদি কর্ণ পর্যন্ত প্রলম্বিত করা যায়, তাহলে অর্ধচন্দ্রাকৃতি আরও চারটি ভূমিখণ্ড, যা এই বর্গক্ষেত্রের বহির্ভূত, শাসন করা যায় ওই একই কেন্দ্র থাকে। বর্গক্ষেত্রের জ্যামিতি এবং বর্গাক্ষেত্রের ইকোনমি আবশ্যিকভাবে এই কেন্দ্রটির দ্বারাই নির্ণীত ও স্থিরীকৃত হয়। বর্গক্ষেত্রটি যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন তার দ্বারা যেমন এই মৌলিক গুণটি অপরিবর্তিত থাকে, বর্গাক্ষেত্রেও এই গুণটি পরিমাণ নিরপেক্ষ। অর্থাৎ কেন্দ্রবিন্দুতে আধিপত্য অনড় থাকলে বিন্দুটি ব্যাসার্ধকে প্রয়োজন ও ক্ষমতা অনুসারে কমিয়ে বাড়িয়ে ক্ষেত্রটিকে আয়ত্তে রাখবেই।'' [১৩]

এই কেন্দ্রবিন্দুটির দখল থাকতে হবে বর্গাদারের স্বার্থে। পার্টির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, চরিত্রহীনতা আধিপত্যবাদকে কেন্দ্রে অনড় রাখার প্রচেষ্টায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আর তাই সমাজের নৈতিকতা ক্রমশই নিম্নগামী। কৃষির উপর নির্ভরশীল মানুষ তাই ধীরে ধীরে মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলছে। লেখক এই সমাজের বর্ণনা দিচ্ছেন এই ভাবে -

"মাঠের কাজ প্রান্তসীমায়, সুতরাং যে কোনো মূল্যে নিজেকে বেচবার জন্য মানুষ প্রস্তুত হয়। যে কোনো মূল্যে, একটা মুরগির থেকে কমদামে কোনো কুমারী তার একান্ত গোপনীয় নিজস্বতাকে নষ্ট করতে পারে। কোনো মা ক্ষুধার্ত সন্তানকে লুকিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে পারে, যদিও এ কোনো মন্বন্তরের সময় নয়। কোন বাপ সারাদিনের নামমাত্র দামে বিক্রীত শ্রমের রোজগার মুদির পরিবর্তে শুঁড়ির দোকানে দিয়ে আসতে পারে। এইসব অস্বাভাবিক কাণ্ড সেইসব মানুষ করে, যারা অন্য সময় স্ত্রী-কন্যার সম্মান রক্ষার জন্য খুন করতে কিংবা খুন হতে পারে, কিংবা অন্যায়ভাবে প্রতিবেশীর জমি দখল হচ্ছে দেখে লাঠি বা বল্লম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং জান লড়িয়ে দেয়। মেয়ের বিয়ের জন্য বাড়ির গাইটা বিক্রি করতে হল বলে কেঁদে ভাসায় এবং ক্রেতার পিছন পিছন পোয়া মাইল রাস্তা গাইটার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে দৌড়োয় যে, সেও এই মানুষ।'' [১৪]

কৃষি এমন একটি জীবিকা যার ওপর নির্ভর না করলে জীবন চলবে না একমুহূর্তও, কিন্তু এর উৎপাদনকারীরাই সরকারি নানা মারপ্যাঁচে, শোষণের নানান জটিলতায় আপন প্রাথমিক অন্নবস্ত্রের সংস্থানটুকুও জোগাড় করতে পারছে না। ফলে গড়ে উঠছে এমন সময় যেখানে ভূমিহীন বা প্রায় ভূমিহীন কৃষিজীবীদের মধ্যে যারা প্রজননক্ষম তারা তাদের রমণীদের গর্ভে নতুন করে হতাশার বীজ রোপন করছে, যখন রিলিফের রাজনীতিতে রিলিফ না দিয়ে কাউন্টার করা হয়, এই সময়, এই সামাজিক অবমাননার অবস্থান থেকে বেরোনোর স্বপ্ন দেখে কৃষকসমাজ পরশুরামকে কেন্দ্র করে। পরশুরাম যখন ঘোষণা করে - *"জান কবুল, জমি দখল হোমার দিমো না।"* [১৫]

তখন গোটা কৃষকজাতির নেতা হিসাবে শোষক দলের সাথে এক সশস্ত্র প্রতিরোধের মুখোমুখি হয় পরশুরাম। পরশুরাম বাস্তবের মধ্যে থেকে উঠে আসা নেতা, গরীব, নিম্নবর্গীয় মানুষের ভেতরকার নেতা। পঞ্চায়েতের সভায় তার দৈত্যের মত চেহারা নিয়ে ক্রমশ মাথা ছাড়িয়ে ওঠে সে। তার হাতের নির্দেশে সভা নিস্তব্ধ হয়, সে প্রশ্ন করে পঞ্চায়েত আইনের যথার্থতা নিয়ে। তার বয়ান কেবল তার একার নয় এ একটি গোটা শ্রেণির দীর্ঘ অবমাননার তীর্যক প্রতিবাদ - *"কার পঞ্চাইত? কার আইন? মাখন সরকার জানে না, হামরা চার পুরুষ শচীবাবুর জমি আধিচাষী? অপিছার শুধালে নুক করে থাকেন। জ্যালারোক্ কহেন হামার নামোৎ ক্যাস করবা।"* [১৬]

অর্থাৎ পঞ্চায়েত, আইন সমস্তই শোষক দল, শাসকদলের হাতে। পরশুরাম দেখায় আইন আদালতের ফাঁকিবাজির প্রকৃত নমুনা -

"থামেন মশোয়। হামার জমি বেদখল হল্যে হামার খ্যামতা নাই কোর্টৎ আইন আনা করায়া ইনজাশান করি পাঁচশাল দশশাল মামলা করি। হামার বিচার করে থানার বড়োবাবু। রাখাল বড়োবাবুক্ কিনে, বড়োবাবু রাখালোক্ কিনে। অ্যাকে ঝোনে দাম দ্যায় হামার বইনেক্, আরে হামার জমি।" [১৭]

পরশুরাম বুঝতে পারে না কেন তার নামে বার বার দাঙ্গা করার অপবাদ ওঠে এবং

কেন ১০৭ ধারা জারি হয়। দোষ করেন বাবুরা আর কেস হয় খেটে খাওয়া দলের ওপর। এই কুটনীতির শিকার পরশুরাম বা তার সহযোগী কৃষকেরা। তাই সে গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করে -

"অ্যালা বুঝনু সাহেব, বিদ্যাবাবু যেখনটি কহিবেন, সিটাই মানিবার হোবে, নচেৎ আইন - ছিংখলা নষ্ট হোবে। আইন শৃঙ্খলা অ্যানকাই বুঝি, যিটা সোব্বাই মানে। হামার ঘরোৎ ডাকাইত পড়ল, হামি বাধা দিবার পারমো না, অ্যাংকা বুঝি না। হামার বোও বিটিক্ আন্ মানষি বেইজ্জৎ করবি, হামি মুখোৎ আও কাড়বা পারনো না, এ্যানকা বুঝি না সাহেব।'' [১৮]

এতদিন এই সমস্ত অত্যাচার অবমাননা নিরবে সহ্য করে গেছে কৃষকেরা, কিন্তু আর নয়। তাই প্রতীকী ভাবে দেখা যাচ্ছে আজ পরশুরামের দক্ষিণ হস্তের উত্তোলনে স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে গোটা পঞ্চায়েত *"জোতদার যদি কোনো হাংগাম উঠায় এক ছটাক ধান দিমোনা।''* [১৯]

এই আত্মবিশ্বাস সে লাভ করেছে দীর্ঘদিনের চেতনায়। যে সমাজব্যবস্থা, যে রাজনৈতিক পরিকাঠামো, এতদিন ধরে কথার জালে, কপটতার কৌশলে সহজ সরল কৃষকদের নাচিয়েছে, তাদের যথেচ্ছা চালিত করেছে, আজ কৃষককুল সেই চালাকি, সেই কারচুপি বুঝতে পেরেছে। তাই তাদের নেতা পরশুরাম বলতে পেরেছে -

" হামার সাতপুরুষে কেহ দাঙ্গা করে নাই, হামিও দাঙ্গা করি না। সাহেব, হামাক দেখাও, গেরামে পাটি করে এমুন ক-টা ন্যাতার জমি আধি রেকড হয়্যাছে, আঙুল গুন্যে দেখামো? হামার কথা লিখ্যা রাখেন সাহেব, দাঙ্গা করবি ইনারা- পরশুরাম মাল দাঙ্গায় যাবে না, কিন্তুক ধান নিজের গোলাৎ তুলবে।'' [২০]

পরশুরাম এই বলে চেয়ার ঠেলে উঠে বেরিয়ে যায়। এর পরের বাক্যটি লক্ষণীয় -

"তারাপদ এবং তার দলের অন্যান্যরা তাকে অনুসরণ করে।'' [২১]

তারাপদ – যে চরিত্রটির বয়ানেই 'বর্গক্ষেত্রে'-র কৃষক সংগ্রামের নানা প্রেক্ষিত

বিশদ বিশ্লেষণে উঠে এসেছে, যে বাম দলের একজন সৎ নেতা, সে আজ পরশুরামের অনুগামী। কেননা সে বুঝতে পেরেছে এই নেতৃত্বকে অনুসরণেই তার আসল লড়াই। প্রচলিত এলিট রাজনৈতিক চেতনার বিপরীতে এ এক নিম্নবর্গীয়ের স্বাধীন চেতনা। এর মধ্য দিয়েই বামপন্থী দল - সরকার - আমলা পুলিশ মিলিয়ে গড়ে ওঠা কৃষকবিরোধী সামন্তবাদী শক্তির বিরুদ্ধে প্রান্তিক কৃষকের দুই পক্ষ শ্রেণি সংগ্রাম পাবে এক নতুন পর্যায়, নতুন স্তর। পরশুরামের জাগরণেই তারাপদের মুক্তি।

"মুক্তি মুক্তি, চিনি সে তীব্র সুখ।" [২২]

তারাপদর চোখ দিয়ে কৃষক সংগ্রামের নানান দিক লেখক অভিজিৎ 'বর্গক্ষেত্র'-এর আখ্যানে তুলে ধরেছেন। যার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন পশ্চিমবঙ্গে বাম শাসনে কৃষক আন্দোলনের প্রকৃত চরিত্রটি উন্মোচিত হয়েছে, তেমনি ভূমিসংস্কারের আসল প্রতিবিপ্লবী উদ্দেশ্যটুকুও আর আড়ালে থাকে নি। তাই দেখেছি শচীকান্ত আস্তিককে কথার ফাঁদে ফেলে তড়িঘড়ি বিক্রি করে দিয়েছে তার জমি রাখাল সরকারের কাছে। সেই রাখাল সরকার জমি থেকে পরশুরামদের উচ্ছেদ করতে সাহায্য নিয়েছে এমন অফিসারের যার উচ্ছেদ কার্যের বিনিময় মূল্য পরশুরামের ভগ্নী সারির দেহ সম্ভোগ। রাখাল এই মূল্য দানে সম্মত হয় কেননা –

"রাখাল অবস্থাপন্ন জোতদার, কাজেই মা-বোনের থেকে পয়সার দাম তার কাছে বেশি।" [২৩]

আর জমি তো এর চেয়েও আকর্ষণীয় বস্তু যা টিকিয়ে রাখতে হয় দখল দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে, আইনি ক্রিয়াকলাপ দিয়ে। এই জমি অধিগ্রহণ আইন এবং তৎসংযুক্ত নানান রাজনৈতিক মারপ্যাঁচের যথার্থ চিত্রকে লেখক অভিজিৎ বহুমাত্রিকতা দান করেছেন তাঁর 'বর্গক্ষেত্র' উপন্যাসে। প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিতে পরিণত কমিউনিস্ট পার্টির ক্রমবর্ধমান অন্তঃসার শূন্যতাও যেখানে উন্মোচিত হয়েছে। সব পক্ষেরই এবং সব প্রশাসনেরই লক্ষ্য যাতে স্থিতাবস্থা বজায় থাকে। আর –

"ভূমিসংস্কার, ভূমি অধিগ্রহণ এবং সেটেলমেন্ট, এই বিভাগগুলিতে যারা কাজ করে তাদের মধ্যে একদল খুব খুশি। এই সব বিভাগের আইনে যত ধারা, তাঁর বহুগুণ উপধারা। আইনের সংখ্যা যত বাড়ে ফ্যাকড়া তত বাড়ে। ফ্যাকড়া যত বাড়ে পয়সা আসার অলিগলি ততই বেশি করে গড়িয়ে ওঠে।'' [২৪]

অর্থাৎ আত্মস্বার্থ চরিতার্থতাই কেবল হয়ে উঠেছে 'ভূমিসংস্কার আইন' এর মত উল্লেখনীয় পদক্ষেপের অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রকৃত ভূমিসংস্কার কার্যকর করার একটাই লক্ষ্য ছিল - স্ব-নির্ভর অর্থনীতির বিকাশ সুনিশ্চিত করা। তার জন্য একদিকে যেমন দরকার ছিল কৃষকদের হাতে জমি, তেমনি একই সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণি সহ কৃষক ও অন্যান্য মেহনতী মানুষের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা। কিন্তু বাস্তবে ভূমি সংস্কারের লক্ষ্য এবং উপাদান কোনো কিছুই স্বস্থানে বজায় থাকে নি। বরং প্রবলিত উন্নয়নের ধারণাটি যে কর্পোরেট সংস্থাগুলির স্বার্থরক্ষার তাগিদেই সৃষ্টি এবং চালিত - এই সত্যটি আর লুকিয়ে থাকে নি। প্রমাণ -

"সেই তেভাগা কি তারও আগের থেকে যারা পার্টির সঙ্গে আছে এরকম সাধারণ অশিক্ষিত কৃষককর্মীদের অনেকেই এখন গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে নির্বাচিত হয়েছে। এর সঙ্গে আরো একদল মানুষ এইসব পদে এসেছে, এরা হলো গ্রামাঞ্চলের শিক্ষিত ও সচ্ছল অংশ। এছাড়া আছে অসংখ্য সুযোগসন্ধানী ও বহুরূপী। ওপরের তিন ধরনের মানুষের মধ্যে কোনো একটি স্তরকেও সম্পূর্ণত সৎ ও আদর্শনিষ্ঠ মনে করার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই।'' [২৫]

কিন্তু পাশাপাশি ছিলেন কিছু সৎ পার্টিকর্মী, কিন্তু তাদের ভূমিকা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রয়ে গেছিল পরোক্ষ দ্রষ্টা বা মূক দর্শকের। শশাঙ্কর দৃষ্টান্তে লেখক দেখান সৎ পার্টি কর্মীর ভূমিকা। সে বোঝে অন্তরঙ্গ, বহিরঙ্গ একাকার। সে জানে যে, মানুষের মুক্তির জন্য সে লড়াইয়ে পার্টিতে এসেছিল। আজ পার্টিতে নানা মুনির নানা মতে ও স্বার্থান্বেষিতায় সে তার উদ্দেশ্য লাভে অক্ষম। তারাপদ যদিও এর বিরুদ্ধে, পার্টির বিরুদ্ধে যেতে চেয়েছে, -

কিন্তু তাকেও উপন্যাসে প্রচলিত এলিট নেতৃত্বের ভূমিকায়ই নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখতে হয়েছে। তাই শেষে তাকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় অনুসরণ করতে হয়েছে পরশুরামকে। যে পরশুরামের কাছে জমি তার 'মাও' অর্থাৎ জননী। লেখক দেখতে চেয়েছেন মাটির যারা সবচেয়ে কাছের তাদের নিয়েই গড়ে তুলতে হবে মাটির সংস্কার, জমির সংস্কার। অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য বলেন :

"ভূমি সংস্কারের জোয়ার পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলকে বহুক্ষেত্রে সামন্তবাদী বদ্ধতা ও আধিপত্যবাদের মৌরসীপাট্টা থেকে মুক্ত করেছিল। তৈরি-হচ্ছিল নতুন শ্রেণিচেতনা, ভেঙে যাচ্ছিল পুরোনো সামাজিক বর্গায়তনগুলি। দেখা দিচ্ছিল নতুন মানুষের সম্ভাবনা, স্বপ্ন- আকাঙ্খা উৎসাহেব নতুন অভিব্যক্তি। তালে - লয়ে সুরে স্পন্দিত হচ্ছিল জীবন। বলা বাহুল্য; এই জীবনের চলচ্ছবি প্রকাশ করার জন্যে নতুন ধরনের আখ্যান ও পাঠকৃতি অপরিহার্য। নাগরিক বিদূষণ, ছদ্মবেশের চাতুর্য ও ফাঁপা বৌদ্ধিকতার প্রগল্‌ভ আড়ম্বর যখন সময় ও পরিসরের মিথ্যা বয়ান তৈরি করে চলেছে, নতুন প্রজন্মের কথাকারেরা তাঁদের প্রতিবেদনে নিয়ে এলেন প্রাকৃতায়ন ও উত্তরায়ণ মনস্কতার বিশল্যকরণী।"[২৬]

যার অন্যতম উদাহরণ লেখক অভিজিৎ সেনের 'বর্গক্ষেত্র' যা লেখকের উপন্যাস লেখার তৃতীয় প্রচেষ্টা। লেখক ১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বরে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন গ্রন্থটি। উপন্যাসটি পড়ে লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী যে মতামত ব্যক্ত করেছিলেন তার সাথে আজ আমরা সকলেই সহমত হতে বাধ্য। মহাশ্বেতা দেবী লেখককে চিঠিতে লিখছেন –

"তোমার লেখা আইন ও শৃঙ্খলা বর্তিকায়, ব্যবচ্ছেদ– প্রমায় যাচ্ছে পূজায়। কিন্তু অভিজিৎ, বর্গক্ষেত্রে এ কি করেছ? অসামান্য লেখা হয়েছে। পরশুরাম প্রাক্ পুরাণিক আয়তন পেয়েছে। তোমার পক্ষে এখন কলম থামানো সম্ভব বা উচিত হবে না।"[২৭]

অভিজিৎ সেনের বিভিন্ন উপন্যাসে কোন না কোন না কোন ভাবে হাজির হয়েছে কৃষি জীবন। লেখক বড় দরদের সঙ্গে কৃষক জীবনকে তার রচনায় তুলে ধরেছেন যার সার্থক প্রমাণ রয়েছে আমাদের এই অধ্যায়ে আলোচ্য দ্বিতীয় উপন্যাস 'হলুদ রঙের সূর্য'

তেও। হলুদ রঙের সূর্য' উপন্যাসে লেখক উদ্বাস্তু কৃষকদের যে কঠোর সংগ্রামের কথা বলেছেন, সেই সংগ্রাম কেবল একটি বাড়ি, উদ্বাস্তুর নতুন ঠিকানা সন্ধান কিংবা দুবেলার অন্ন সংস্থানের সংগ্রাম নয়– বরং এর মধ্য দিয়ে তারা নিজেদের অস্তিত্বকেই নতুন ভাবে দাঁড় করাতে চায় – এই অস্তিত্ব রাজনৈতিক প্রক্রিয়াতে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। তাদের নির্দিষ্ট কোনো স্থান নেই। পূর্ব পাকিস্তানে বা বাংলাদেশে তারা হিন্দু - এই অপরাধে আক্রান্ত হয়, – আবার ভারতবর্ষের মতো অখণ্ড দেশের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও নিজের দেশেই চিহ্নিত হয় 'উদ্বাস্তু' নামে। আত্মপরিচয় অর্জনের সংগ্রাম নিয়ে গড়ে ওঠা আখ্যানে – এতে একদিকে উঠে আসে কৃষকদের সাধারণ জীবন, অন্যদিকে তেমনি একটা সাংঘাতিক অস্তিত্বের সংকটও আভাসিত হয়। অভিজিৎ এই অস্তিত্বের সংকটের গোড়া ধরে নাড়া দেবার চেষ্টা। করেছেন তাঁর 'হলুদ রঙের সূর্য' উপন্যাসে।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র সহদেব বিশ্বাস পূর্ববঙ্গের মানুষ। একাত্তরের যুদ্ধের ডামাডোলে ছিটকে এসে পড়েছে বিভক্ত ভারতবর্ষে। তার পরিবার পরিজন দীর্ঘদিন দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে ছিল রিফিউজি ক্যাম্পে। সে নিজে কিছুদিন ছিল মুক্তিবাহিনীর ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারও আস্তানা হয়েছে রিফিউজি ক্যাম্পে। দেশ ভেঙেছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু সহদেব আর ফিরে যায়নি 'ও দেশে' (পূর্ববঙ্গ)। সে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে পেরেছিল যুদ্ধ শেষ হলেও এই যুদ্ধের রেশ থেকে যাবে।

"সে বুঝেছিল ওদেশে আর থাকা যাবে না। নিত্য তিরিশদিন ঝামেলা আর অশান্তি। সে অভিজ্ঞতায় বুঝেছিল যুদ্ধ শেষ হলেও ঝামেলা আরও বাড়বে।"[২৮]

তাই এদেশেই একটা কিছু বন্দোবস্ত করতে চেয়েছিল নিজের ও নিজের জাতির লোকেদের। তাই বামনীর গিঁট এর জমির মালিকানার লড়াই সে 'লড়েছে'। এ লড়াই কখনো অর্থের বিনিময়ে শান্ত প্রক্রিয়ায় জমি কেনাবেচায় আবার কখনো বন্দুক হাতে সশস্ত্র বিপ্লবে। মহদেব বারুণীর চরের যে দুটি শ্বাপদসঙ্কুল গিঁটে নিজের জাতির ভবিষ্যত বসতি কল্পনা করেছিল, কল্পনা করেছিল চাষের জমিতে ধান, শাক্-পালার।, সম্ভার যা সে

দয়াঘোষের কাছ থেকে কিনতে চেয়েছিল। সে জানত একবার গেরস্ত গড়ে তুলতে পারলেই তার কাজ হয়ে যাবে, জমির অভাব হবে না। কিন্তু সে দয়াঘোষকে ঠকাতে চায় নি, দাম দিয়েই জমি ক্রয় করতে চেয়েছিল। কিন্তু একথাও ঠিক যে–

"সহদেব বিশ্বাস নিজেও জানে জমি কিভাবে আসে। সরলা ব্রাহ্মনীর এই পয়স্তি - ঘোষেরা সেই কৌশলেই নিয়েছে, যে কৌশলে জমি চিরকাল নেওয়া হয়। জমির প্রথম ও শেষ আইনি কথা দখল। তার মধ্যে জবরদখলও পড়ে। যে যুদ্ধটায় সে অংশগ্রহন করেছিল সেটাও কি জমি দখলের লড়াই নয়? যে জিতেছে দখল তার। দখল যার আইন তার।''[২৯]

কিন্তু বামনীর প্রথম গিঁটদুটো সে দখল না করে চেয়েছিল কিনতে। কেননা পূর্ববঙ্গ থেকে আসা এই উদ্বাস্তু কৃষকেরা চায়নি তাদের স্থিত হওয়ার ভিত দখলদারির ওপর হোক। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তারা বুঝেছে শাসক এবং শোষিতের মধ্যে ক্রয় - বিক্রয়ের সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া অনেক কষ্টকর। আধিপত্যবাদ শ্রেনী কখনো চায় না সাধারণ মানুষ মাথা তুলে দাঁড়াক। তারা চায় এরা সর্বদাই অধীনে থাকুক, থাকুক আশ্রিত হয়ে। দয়াঘোষও এমনই চেয়েছিলেন, তাই বামনীর দুটো গিঁট সহদেব বিশ্বাসের কাছে বিক্রয় করেছিলেন। তবে দাম নিতে তিনি কোনো উদারতা দেখান নি। পেছনে উদ্দেশ্যও ছিল পুত্র ভবেশের গমকল খোলার জন্য টাকার জোগান এবং একই সাথে জনবল বৃদ্ধি। পিতা দয়া ঘোষের মৃত্যুর পর পুত্র ভবেশও এই জনবল তার আপনার বলে মেনে নিয়েছিল এবং একই সাথে তাদের শোষণ করার এবং ঠকাবার একচ্ছত্র আধিপত্যও যে তার আছে– তাও বুঝে নিয়েছিল। তাই অশিক্ষিত, দরিদ্র, কৃষকদের কষ্টার্জিত দাদনের ঋণ কখনো শোধ হতো না।

"যে টাকা সমবায় সমিতি থেকে তারা পেত, তার দ্বিগুণ টাকা তাদের নামে অনুমোদন করানো হত। সই- সাবুদ সব আগে থেকেই করানো হতো বলে ঝামেলা হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। টাকা দাদনের সময় সমবায় পরিদর্শকও উপস্থিত থাকত। দাদন হত পুরো টাকা, হাতে পাওয়া যেত আধা। বাকি আধা টাকা সেক্রেটারি, চেয়ারম্যান, ম্যানেজার ইত্যাদির মধ্যে ক্ষমতা অনুযায়ী ভাগ হত। সে টাকার পরিমান খুব কম নয়। এই টাকা

দিয়ে সারা বছর ধান, চাল পাট এবং লঙ্কার মজুতদারি ব্যবসা করত তারা।''[৩০]

তাই চাষ করার জন্য কৃষকদের সেই দয়া ঘোষ, ভবেশ কিংবা এদের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর কাছেই ঘরোয়া ঋণের জন্য হাত পাততে হত। সে ঋণের শর্ত তারা জানত, জানত চাষি মরে গেলেও চাষির ঋণ কখনো শেষ হয় না। কিন্তু তাও এই পথেই এগোতে হত।

সহদেব বিশ্বাসকে কাহিনির কেন্দ্রে স্থাপন করে লেখক দেখালেন কীভাবে একটি বঞ্চিত, একটি বিতাড়িত, একটি লাঞ্ছিত গোষ্ঠীর নেতা তার জাতির উন্নয়ন কল্পে প্রাণপন প্রচেষ্টা করছে। লেখকের এই আখ্যানে কেবল কৃষক জীবনের নানা আখ্যানই যে উঠে এসেছে এমন নয়– সমাজের নানা স্তরের মানুষের বিচিত্র অবস্থান তাদের কর্মসূচী, চিন্তাচেতনা, রাজনৈতিক বিশ্বাস অবিশ্বাস এবং শোষক ও শোষিতের সম্পর্কের বহু স্বরিকতা নানা রঙ দান করেছে 'হলুদ রঙের সূর্য ' রচনাটিকে। সহদেব বিশ্বাস, সাঁওতাল সহা কিসকু, সুদেব, কানু, শচীন রায়, পুলিশ অফিসার অসীম, মিঃ মুখার্জি, মালবিকা সরকার, দালি, দয়া ঘোষ, নয়ন গুনমান,– এরা প্রত্যেকেই এক একটি শ্রেণির প্রতিনিধি। কেউ শোষণ করছে, কেউ শোষিত হচ্ছে, আবার কেউ শোষক বা শোষিত উভয় বর্গের মধ্যেই না পড়ে কিছু একটা করার চেষ্টা করছে কিন্তু পেরে উঠছে না, যার সার্থক প্রমাণ সুদেব। এই সুদেব চরিত্রটির মধ্যে লেখকস্বরের প্রক্ষেপ রয়েছে। তার চোখ দিয়েই উপন্যাসের বেশির ভাগ কার্যকলাপ উঠে এসেছে। সে বর্তমানে একটি এন. জি. ও র কর্মকতা, পূর্বে ছিল একজন 'কলকাতাবাসী ' এবং বামদলের সমর্থক ও কর্মকতা। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে পার্টির বহুধাবিভাজন তথা চরমপন্থী, নরমপন্থী, নকশাল, বুর্জোয়াঘেঁষা, বুর্জোয়াবিরোধী– নানান স্থর বিভাজনের কোথাও নিজেকে মানানসই তথা উপযুক্ত না পেয়ে বর্তমানে শচীন রায়ের সমাজ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের একজন কর্মকর্তা।

"সুদেব তার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় একটা জিনিস পরিস্কার বুঝেছে কবিতা লেখা যেমন সবার কাজ নয়, সমাজ পরিবর্তন বা বিপ্লব করাও সবার কাজ হতে পারে না। সে আরো বুঝেছে যে রাজনীতি করাও তার কাজ নয়।''[৩১]

তাই আজ কলকাতা ছেড়ে রাসপাড়া গ্রামের বেসরকারি উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রোজেক্ট অফিসার। নতুন গড়ে ওঠা বেনী গ্রামও তার কাজের আওতায় পড়ে। তাই গ্রামের প্রধান সহদেব বিশ্বাসের সাথেও তার স্বাভাবিক হৃদ্যতা। হৃদ্যতা কেবল গ্রামের প্রধান বলে নয়, সহদেব একজন সৎ, কর্মঠ, উদ্যোগী মানুষ বলেও। সম্ভবত সুদেব যা করতে পারেনি, তার প্রচেষ্টার উদ্যোগ যে সহদেবের মধ্যে দেখতে পেরেছিল। তাই সে সহদেবের সঙ্গে ছিল, সঙ্গে ছিল যখন ভবেশ ঘোষ তাদের ঠকায়, সঙ্গে ছিল যখন দাঙ্গার দায়ে সহদেব জেলবন্দি হয়, সঙ্গে ছিল যখন বনমালী ঘোষ সহা কিসকুকে ঠকায় ও সহদেব বিশ্বাস তাকে আশ্রয় দেয়, সঙ্গে ছিল যখন গভীর রাতে বন্দুক নিয়ে সহদেব ডাকাতদলকে ধাওয়া করে। সহদেব বিশ্বাস ও সুদেব এই দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষিত থেকে উঠে এলেও তারা তাদের পরিসরের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠে এক মানবিক ঐকান্তিকতাবোধে নিজেদের আবদ্ধ করতে পেরেছিল।

"সুদেব আচমকা এরকম একটা জীবনের মধ্যে এসে পড়েছিল তার অভ্যস্ত দৃষ্টিভঙ্গির এবং অভ্যস্ত জীবন যাত্রার বিপরীতে যা কিছুই এতকাল সামনে এসেছে, সবই মনে হয়েছে বাতিল, ব্যাধিগ্রস্ত এবং বর্জ্য। কিন্তু এই প্রথম, এই মেখলাহার-নামাবন্দর-নসিপুরের গ্রামের পথে পথে ঘুরে, মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে তার মনে হয়েছে, এই দুই বিপরীতকে শুধু গ্রহণ বর্জনের সাধারণ হিসাবে রাখা ভুল। দুই বিপরীত, একটি অন্যটির বিকল্পও বটে। এই দুই বিকল্পের মধ্যে, এই প্রথম অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে তার নজরে এসেছে, একটা বোঝাপড়া হতে পারত। এতকালের অভ্যাসে যাকে সে পরাজিত মনে করেছে, স্বাভাবিক বিকাশ হলে সে জিততেও পারত।''[৩২]

এই 'বোঝাপড়া'র প্রয়াসই সে করেছে সহদেবের সান্নিধ্যে এবং শেষে আততায়ীর গুলিতে যে মর্মান্তিক মৃত্যু তার মধ্য দিয়ে সে জিতেও গেছে বোধ হয়।

উপন্যাসে আরেকটি অন্যতম স্তর হলো সহা কিসকু প্রসঙ্গ। সহদেব বিশ্বাস এবং সহদেব কিসকু একে অপরের মিতা, উভয়ের সমান নাম। একজন নমঃশূদ্র, একজন

সাঁওতাল। বর্ণ তথা শ্রেণি বিন্যাসে উভয়েই একেবারে নিম্নস্তরের। উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক গভীর বন্ধুত্বের। এই সহা কিসকু-র দীর্ঘদিন থেকে আধি করা বনমালী ঘোষের ন'বিঘা জমি ঘোষ ফিরিয়ে নিতে চায়। কারণ রিভার লিফ্‌ট বসবে সরলা নদীতে। তাতে জমি তিন ফসলা হবে। আর সাঁওতাল সহা কিসকু এই ফসলের ভাগ পাক এমন কোনো ইচ্ছা বনমালী ঘোষের নেই। কারণ –

"সাঁওতালের কপালে শুধু অফলা জমি। সাঁওতাল শুধু অফলা জমিকে ফলগতি করবে। রক্ত দিয়ে শুকনো ভাঙা জমিতে সজল করবে। আর সমস্ত সুফলা জমিগুলোতে বেড়া উঠবে।''[৩৩]

তাই - সহা কিসকুর উচ্ছেদ অনিবার্য। তার আর এই জমিতে অধিকার নেই কিন্তু এই জমির বর্গারেকর্ডের সময় সহার আত্মা তাকে নিজের নাম রেকর্ড করতে বাধা দিয়েছিল।

"যতবার রেকর্ড করাবার কথা ভেবেছি, ততবার আমার সাঁওতাল আত্মা ছোট হয়ে গেছে, মানুষটার সাথে বেইমানি করব ?''[৩৪]

কিন্তু আজ সেই বনমালী ঘোষ আধি - বর্গা কিছুই মানে বা। পঞ্চায়েতে এ নিয়ে কথা ওঠে কিন্তু বর্গাবিরোধের নিষ্পত্তি পঞ্চায়েত সব সময় করতে পারে না। তাই কোর্টে মামলা হয়। মাললার দীর্ঘ মেয়াদ, প্রচুর অর্থব্যয়, সহাকে কাঙাল করে দেয়। আর্থিক দিক থেকে, মানসিক দিক থেকে। সে আইন কানুনের মারপ্যাঁচে বারে বারে পর্যুদস্ত হয়।–

"মূর্খ সাঁওতালের মৃত্যু পর্যন্ত একটার পর একটা শিক্ষা হতে থাকলেও, কাণ্ডজ্ঞান কখনোই বাড়ে না। সে শুধু অবাক হতেই শেখে।''[৩৫]

সে ধীরে ধীরে বুঝতে থাকে আইন বুঝলে আইন মানাও সহজ, না মানাও সহজ। সে এতকাল জানতো না আধিয়ার – জোতদারে আইনের ভাগ বারো আনা চার আনা কিংবা আধি ধানের রসিদ রাখতে লাগে। এসব বোঝার ফাঁকেই সে উচ্ছেদ হয়ে গেল, পড়ে গেল আইনি মারপ্যাঁচের ফাঁদে। সহার এই অবস্থা তার সাঁওতাল ভাইদের পীড়িত করে। তাই শুকড়া সাওতাল .... বলে–

"এই এক লাথি, এই আর এক লাথি, এই আরও এক লাথি। লাথি আধিতে, লাথি ধানে, লাথি আইন - কানুন- দারোগা - হাজত - সব কিছুতে,.....।"[৩৬]

কিন্তু চরম হয় তখন যখন তার সাঁওতাল ভাইয়েরাই তাকে 'ডান' বলে ধরে নেয়। যদিও এই ধরে নেওয়ার পেছনে নয়ন গুনমানের কিন্তু আজগুবি কার্যকলাপ, দালির দুর্বল মন, সিমন গুনমানের নামডাকের চাইতেও যা সর্বাধিক ক্রিয়াশীল ছিল তা হলো শোষকদলের অঙ্গুলিহেলন। যার প্রমাণ রয়েছে নকশাল যুবকের বয়ানে–

"যে লোকটা সহাকে জমি থেকে উচ্ছেদ করল, তাকে ডান বানালো, তার কি বেঁচে থাকার কোন দরকার আছে? আমার কথা লিখে রাখেন, সহা কিসকু খুন হয়ে যাবে।"[৩২]

সহা কিসকু সত্যিই খুন হয়েছিল, খুন হয়েছিল তার আপন ছোট ভাই গোচ্ এর হাতে। যে গোচ্‌কে সে ছোট থেকে বড় করেছে সন্তান স্নেহে। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে লেখক দেখাচ্ছেন কীভাবে সাধারণ মানুষের সংস্কার, বলা ভালো কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাসকে লাজে লাগিয়ে আপন কাজ করিয়ে নিচ্ছে বুর্জোয়া শ্রেণি। শোষিত হচ্ছে, প্রাণ হারাচ্ছে খেটে খাওয়া মানুষ, কৃষক।

কিন্তু কৃষকদের উন্নতির লক্ষ্যে প্রচুর অর্থসাহায্য বরাদ্দ হচ্ছে। গড়ে উঠছে সমবায় সমিতি, বেসরকারি উন্নয়ন কার্যালয়। কিন্তু এ থেকে কৃষক প্রকৃত অর্থে কতটা লাভবান হচ্ছে তা প্রশ্নসাপেক্ষ। বরং কিছু মধ্যস্বত্বভোগীরাই উন্নতি করছে তড়িঘড়ি। শোষক শ্রেণি একথা বুঝতে পেরেছে যে–

"গরিব মানুষের জন্য কিছু করার ধান্দা সরকার বন্ধ করতে পারবে না, সে যে সরকারই আসুক না। আর এইসব প্রক্রিয়ায় যে পরিমান টাকা গ্রামে আসছে, অতীতে তেমনটি আর কোনদিন হয়নি। এ জিনিস আরো বাড়বে। আর যত বাড়বে বনমালী, ভবেশ, কন্দর্পদের রোজগারের নতুন নতুন রাস্তা বেরোবে।"[৩৮]

আর কৃষক খেটে যাবে অন্যের জমিতে – খাটনির শেষে যা পাবে তাতে তা চলে যাবে জমিদারের ঋণ শোধ করতে। শূন্য হাতে ফিরবে ঘরে। নেশা করবে। নেশা করবে তার

অক্ষমতার জন্য, নেশা করবে তার অবস্থানের সংকীর্ণতা ভুলে যাবার জন্য। আবার রাতে বৃষ্টি হতে খেতে আল বাধা হয়েছে কি না, এই চিন্তায় ঘুম নষ্ট করবে।

এই 'লোকগুলার তো অ্যানা বন্দোবস্ত করবা হবে,'– এই চিন্তাই করেছিল সহদের বিশ্বাস। তাই বেনীর তৃতীয় গিঁটটি সে দখলে আনতে চেয়েছিল তার অন্যান্য কৃষক ভাইদের জন্য। সে জানতো – *"জমি দখলের কিছু প্রাচীন নিয়ম কানুন আছে।"*[৩৯] তাই এই নিয়ম কানুন মেনেই সহদের বিশ্বাস এগোয়। বেনীর গিঁট আবাদি জমি নয়। কাজেই আগাছা কেটে ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে সেখানে আট দশখানা চালা তুলে ফেলে বেনীর মানুষ। সহদেব জানে

"এই চালার দখল রাখতে হবে। তার জন্য আইনি এবং যতরকম প্রতিকুলতাই হোক, আটকাতে হবে, দখল ধরে রাখতে দরকার হলে মারতে হবে, না হলে মরতে হবে। আদিম কাল থেকে দখলের লড়াই এই রকমই।"[৪০]

এই লড়াই করার জন্য তাকে নকশালদের সাহায্য নিতে হয় না। সে সাহায্য নিতে চায় না। কেননা সে জানে নিজেদের অধিকারের লড়াই নিজেদেরকেই লড়তে হয়। মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাকে একথা শিখিয়েছে। সে বুঝেছে সাধারণ জনগণকে নিজের অধিকারের দখল নিজেকেই ধরে রাখতে হবে তাহলেই স্বাধীনতা লাভ সম্ভব, উন্নয়ণ সম্ভব। কোনো রাজনৈতিক দলের মুখাপেক্ষি হলে চলবে না। তাই সে নকশাল শংকরবাবুকে বলে–

"যুদ্ধ এভাবে হয় না, শংকরবাবু। আপনারা এ কাজে পাঁচ - দশজনা মানুষ পাবেন, তারা পাঁচ - দশটা খুন - খারাবি করবে। তাবাদে আপনারা পালাবেন, গেরামের চেংড়াগুলো মারা পড়বে পুলিশের হাতে, জোতদারের হাতে। - গেরামের মানুষ গুলার হুজ্জতি বাড়বে। এতে জিনিসের দাম কমবে না, জন - পাটের মজুরি বাড়বে না, চোরা জমি উদ্ধার হবে না, বোবর গরিব মানুষে আপনাক্ কমরেট কবে না।"[৪১]

এভাবে যখন বাইরের সাহায্য ছাড়া আপন তাগিদে আপন অধিকারের লড়াই

কৃষক লড়ে তখন একসময় রাজনীতি করা সুদেবকেও তাকে অনুসরণ করতে হয়। যেমন অনুসরণ করেছিল তারাপদ 'বর্গক্ষেত্র' - এ পরশুরামকে।

এই ভাবে লেখক অভিজিৎ সেনের 'মেঘের নদী' উপন্যাসটিতেও কৃষক ও কৃষিজীবনের নানা প্রেক্ষিত উঠে এসেছে। 'মেঘেরনদী' উপন্যাসটি নানাকারণে কৃষক জীবন কেন্দ্রিক হওয়া সত্বেও কৃষকজীবন, কৃষিকেন্দ্রিক শোষণব্যাবস্থা, শোষণের শুধু জাতাকলের বর্ননার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে নি। বেশ কয়েকটি জটিল বিষয় অভিজিৎ এই উপন্যাসে স্পর্শ করেছেন। ফলে উপন্যাসটির অবয়বে তৈরি হয়েছে বেশ কয়েকটি তল (surface), প্রতিটি surface এ জীবন বাস্তবের স্বরূপ ভিন্ন, আর সবগুলি একই আখ্যানের পাত্রে উপস্থাপিত হওয়ায় 'মেঘের নদী' নামের ছোট্ট উপন্যাসটি উত্তরবঙ্গের উদ্বাস্তু কৃষকজীবনের সাদামাটা বাস্তবচিত্রণ হয়েই থাকে নি, বরং তা সময়ের inner structure এ যে জটিল তন্তুসমূহ বিরাজমান তার সবগুলোকেই চিহ্নিত করেছে। দেশ-কাল সংলগ্ন জীবন বাস্তবের বহুরেখার কাটাকুটিতে এই আখ্যান প্রকৃত প্রস্তাবে বহুরৈখিক বাস্তবের এক polyphony হয়ে উঠেছে।

এই উপন্যাসে উত্তরবঙ্গের কোনো এক জেলা সদরের জেলা পরিষদের একটি সভার কার্যবিবরণী রয়েছে। সংক্ষিপ্ত এই কার্যবিবরণীটি উপন্যাসের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং বহুস্বরিক। পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়নের প্রক্রিয়ার আমলাতান্ত্রিক কাজকর্মের স্বরূপ, কৃষি ব্যাবস্থায় ব্যাঙ্কের ভূমিকা, রাজনৈতিক শক্তির ভূমিকা,--- ইত্যাদি নানা বিষয় অত্যন্ত বাস্তবতার সঙ্গে হাজির হয়েছে উপন্যাসে। অভিজিৎ দেখাচ্ছেন দলমত নির্বিশেষে রাজনৈতিক সংস্কৃতি হয়ে পড়েছে দায়িত্বজ্ঞানহীন। ফলত লোকসভা, বিধানসভা ইত্যাদিতে জনগণের উন্নয়নের লক্ষ্যে যে সমস্ত আইন এবং পরিকল্পনা গৃহীত হয়, তা বাস্তবায়নে কারও তেমন দায় নেই। জেলার মহকুমা শাসক, যিনি একজন দায়িত্বশীল, স্থানীয় কর্মকর্তা। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের উন্নয়নের প্রধান চালক তিনি। কিন্তু তিনিই ঋণদান কর্মসূচির মাধ্যমে সরকারি প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য, স্থানীয়ভাবে নীতিনির্দেশনার জন্য যে মিটিং হয়

তাতে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন বোধ করেননা। যিনি সরকারের আমলা হিসেবে জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধিত্ব করেন সেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট দু-এক দিন আগে পথ অবরোধ মোকাবিলা করতে গিয়ে কিছু ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং ফলত তিনি খানিকটা লজ্জিত হয়ে আছেন। তার এই লজ্জার কথা কেউ যদি কোনো ভাবে জেনে ফেলে এইভয়ে তিনি এই সভা থেকে পালিয়ে বাঁচতে চান। সামগ্রিক ভাবে উন্নয়নে ব্যাঙ্ক এর যে ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে তা ব্যাঙ্ক এর অফিসারদের কথাবার্তায় পরিস্ফুট হয় না। অর্থাৎ কোনো পক্ষেই কোনো আন্তরিকতা নেই। আর যারা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে এরা কেউ সভায় আহুত হয় না। মহিম শিক্ষিত, সে কৃষিতে যোগদান করেছে এবং মধ্যবিত্ত কৃষক বলেই এই সভাগুলিতে আমন্ত্রণ পায়, কিন্তু সাধারণ কৃষকের প্রতিনিধি সেই সভায় ডাক পায় না। এখানে এই বক্তব্য সমূহ উপস্থাপনের মাধ্যমে অভিজিতের কলম যেন এই প্রশ্ন তুলতে চায়, তাহলে সত্যিকারের উন্নয়ন হবে কি করে? অভিজিতের একটি বৈশিষ্ট হল তিনি নিজে সরাসরি সমাজের বা system এর সমালোচনা করেন না, কিন্তু নিরপেক্ষতার আড়ালে থেকে তিনি ঘটনাকে এমন ভাবে তুলে ধরেন তাতে প্রকৃত বাস্তব ছবিটা উঠে আসে, এবং পাঠক অন্তত সমালোচনা করবার জায়গায় পৌঁছে যান। পাঠকের চেতনাকে এইভাবে অভিজিৎ আঘাত করেন।

অন্যদিকে এই উপন্যাসে উঠে এসেছে সরকারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে NGO (Non Government Organization) বা বেসরকারি সংস্থাগুলির বাড়বাড়ন্ত হয়ে ওঠা বাস্তব। নয়া উপনিবেশবাদী বিশ্বায়ন যা প্রায় ৮০/৯০ এর দশকে জন্ম লাভ করেছে, এর পর থেকেই সারা পৃথিবীতে এই NGO র একটা বিশেষ ভূমিকা দেখা যাচ্ছে। এই সংস্থাগুলির প্রধান কাজ হচ্ছে নানাভাবে fund জোগাড় করে তথাকথিত উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসা। কিন্তু এর সাথে এগুলোর একটি ব্যবসায়িক লক্ষ্যও থাকে। যার কিছু প্রমাণ আমরা পেয়েছি আধুনিক লেখকদের রচনায়। এরকমই একটা উদাহরণ লক্ষ করি ভগীরথ মিশ্রের 'আড়কাঠি' উপন্যাসে। এই উপন্যাসে দেখা গেছে যে 'ইস্ট ওয়েস্ট ফোক ফাউন্ডেশন'

নামক অ্যামেরিকান এক NGO যা লোকসংস্কৃতির চর্চা, প্রসার, গবেষণা ইত্যাদি নিয়ে কাজ করে এবং তা করতে গিয়ে সেই অঞ্চলের গবেষক রাজীবকে তার দালাল বা আড়কাঠিতে পরিণত করে। আত্মপ্রতিষ্ঠার মোহে মধ্যবিত্ত রাজীব ক্রমশ হয়ে ওঠে ফাউন্ডেশনের স্থানীয় কর্মকর্তা। ভগীরথ মিশ্র লক্ষ করেছেন অ্যামেরিকান সংস্থাটির কর্মকৌশল। গ্রামের সহজ সরল মেয়েদের নাচ, গান দেখিয়ে, তাদের নানা stage দেওয়ার নামে এরা কোটি টাকা রোজগার করছে। ভগীরথ এভাবেই অনাবৃত করেছেন NGO র নেতিবাচক ভূমিকা। 'মেঘের নদী' উপন্যাসে অভিজিৎও খুব হালকাভাবে এই NGO সমূহের ভূমিকার ওপর একটা সন্দেহের ভাব ব্যক্ত করেছেন। কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জ্যোতির্ময় রায়ের চাকরি ছেড়ে দিয়ে NGO তে যুক্ত হওয়া এবং মহিমের মত একজন উদ্যমী, পরিশ্রমী মানুষকে তার কর্মকাণ্ডে সামিল করার জন্য এত উৎসাহ দেখানোর মধ্যে কোথাও যেন রয়েছে একটা স্বার্থের চোরাটান। মহিমের সাথে তার মাষ্টারের কথোপকথনের একটা অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে,-

"যদি সত্যিকারের কাজ করতে চাও, গ্রামীণ মানুষের যথার্থ উন্নয়নের কাজ করতে চাও, আমাদের সঙ্গে যোগ দেও।..... স্বেচ্ছাসেবা কেউ করতে বলছে না তোমাকে। তুমি যা করছ তাই কর, যেখানে করছ, সেখানেই কর। কিন্তু আমাদের সঙ্গে সংঘবদ্ধ হয়ে কর। তুমি এনজিও কর। টাকার অভাব হবে না। সারা পৃথিবী এইসব কাজের জন্য টাকা দিচ্ছে। ইদানিং আমাদের সরকারও বেসরকারি সংগঠনকে নানা উন্নয়নের কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য ডাকছে। এনজিওরা পৃথিবীতে রাষ্ট্র ও রাজনীতির বিকল্প শক্তি হিসাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত রকমের মঙ্গলই আমাদের কাম্য।" [৪২]

এভাবেই কৃষিক্ষেত্রে পুঁজির প্রবেশ ঘটছে, সামন্তবাদের মধ্যে পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটছে। এই পুঁজির অনুপ্রবেশ কৃষকদের জন্য এক নতুন সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। এর ফলে যে কৃষকেরা পরিশ্রম করে উৎপাদন করবে, তারা তাদের উৎপাদিত ফসল নিজেরা বাজারজাত করতে পারবে না, তা NGO র মাধ্যমে বাজারজাত হবে, যার ফলে লাভও

হবে এই সংস্থাগুলিরই। অর্থাৎ নতুন রকমের একটা প্রজা শোষণের, কৃষক শোষণের ব্যবস্থা আসছে এই NGO র যত্রতত্র গজিয়ে ওঠার মধ্যে দিয়ে, অভিজিৎ সেন স্পষ্ট ভাবে না হলেও ইঙ্গিতের মাধ্যমে এই শোষণের ব্যাপারটাকে পাঠকের সামনে তুলেছেন।

'মেঘের নদী' উপন্যাসটি শুধুই কৃষকের জীবনের শরিক উপন্যাস মাত্র নয়, এই উপন্যাসে যে সিংহভাগ মানুষ উঠে এসেছে তারা প্রধানত বঙ্গভাষী চরিত্র যারা প্রায় সবাই হচ্ছে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত। এই নমঃশূদ্ররা আমাদের বাঙালি হিন্দু সমাজে বাঁশ- বেতের কাজ করে, মৎস্য চাষ করে, কেউ আবার কৃষিজীবী, বলা ভালো কৃষিশ্রমিক। অর্থাৎ এদের পেশাগুলির কোনোটাই তেমন অর্থকরী নয়। অন্যদিকে শূদ্র বর্গের মধ্যেও এরা নিন্দিত ও নিচু অবস্থানে বাস করে। ইতিহাস থেকে জানা যায় যখন ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হয় তখন নমঃশূদ্র সমাজের কিংবদন্তী নেতা যোগেন্দ্র মণ্ডল পাকিস্তানকে সমর্থন করেন। এটা যেন যে হিন্দু Identity তাকে সারাজীবন অসম্মান করেছে, তার বিরুদ্ধে এক ধরণের প্রতিবাদ। কিন্তু এতে যে তার জাতের খুব উন্নয়ন হয়েছিল তা নয়,– বরং ব্যক্তি যোগেন মণ্ডলের কিছু লাভ হয়েছিল, তা সত্যি। তিনি ক্রমশই একটা রাজনৈতিক পরিস্থিতির ক্রীড়ণক এ পরিণত হয়েছিলেন, উত্তরকালে তিনি পাকিস্তানের মন্ত্রীও হয়েছিলেন। উপন্যাসে যোগেন্দ্র মণ্ডলের প্রসঙ্গ আছে। যাই হোক, এই নমঃশূদ্র জাতের লোকেরা খুব পরিশ্রমী এবং স্বভাবতই এদের মধ্যে ক্ষোভ ক্রোধ কিছুটা বেশী। মূলত পরিশ্রমের যথাযোগ্য মূল্য না পাওয়ায়ই তাদের মধ্যে এই ক্রোধের জন্ম হয়েছে। এরা অত্যন্ত ঐক্যবদ্ধ জাতি। আর এই জাতির একজন দেবোপম ব্যক্তি হলেন দেবেন বিশ্বাস।

দেবেন বিশ্বাস উদ্বাস্তু নমঃশূদ্র সমাজের নেতা। পূর্বপাকিস্তান থেকে সর্বহারা হয়ে আসা স্বজাতীয় লোকেদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা, তাদের নিয়ে জনপদ গঠন, তাদের অন্ন সংস্থান, তাদের নতুন দেশে নতুন ভাবে থিতু করাই জীবনের একমাত্র প্রধান উদ্দেশ্য রূপে গ্রহণ করেছেন দেবেন বিশ্বাস। মহিমের সাথে অসুস্থ দেবেন বিশ্বাসের আলোচনায় রয়েছে এর প্রমাণ–

"যে সব মানুষ দণ্ডকারণ্য, আন্দামান কিংবা আসামে হারিয়ে গেছে, আমাদের গোষ্ঠীর

সব মানুষ, সবাইকে খুঁজে নিয়ে আসব। এখানে তাদের ঘর করে দেব, জমি করে দেব।'' [৪৩]

দেবেন বিশ্বাস যথার্থ অর্থেই একজন গোষ্ঠী নায়ক। তাঁকে সকলে বিশ্বাস করে, শ্রদ্ধা করে, মানে। তিনি স্কুল গঠন করেছেন, কলেজ গঠন করেছেন। তাঁর গোষ্ঠীর লোকেরা যাতে পড়াশুনা করতে পারে, যাতে পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হতে পারে– এই চেষ্টাটা তিনি করেছেন। যদিও এটা খুব পরিষ্কার না যে এই সমস্ত কাজ করার জন্য উদ্যমের সাথে যে অর্থের প্রয়োজন হয় তা উদ্বাস্তু দেবেন বিশ্বাস কোথা থেকে জোগাড় করেছিলেন? তবে উপন্যাস থেকে একথা অনুমান করা যায় যে সম্ভবত তিনি নমঃশূদ্র সমাজের বিত্তশালী পরিবারেরই লোক ছিলেন। আর সেই সঙ্গে লোকটির মধ্যে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠালাভের লোভটাও ছিল কিছু কম। শুধু এটা নয়, এর পাশাপাশি ব্যক্তিজীবনেও তিনি কিছু অনুশাসন মেনে চলতেন। নিম্নশ্রেনীর হিন্দু সমাজে যৌনতা, যৌন সম্পর্ক, অবৈধ সম্পর্ক ইত্যাদি নিয়ে এতটা স্পর্শকাতরতা নেই, যতটা তথাকথিত উচ্চবর্গীয়দের মধ্যে রয়েছে। এর প্রমাণ আমরা তারাশঙ্করের বিভিন্ন উপন্যাসের মধ্যেও পেয়েছি। কিন্তু দেবেন বিশ্বাস একেবারেই পিউরিটান মানসিকতার লোক ছিলেন। তিনি তাঁর শ্রেণির উন্নয়নের জন্য নিজেকে যথাসম্ভব এ সমস্ত ব্যাপার থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেছেন, এবং পুত্র মহিমকেও এই পরামর্শই দিয়েছেন।

মহিম দেবেন বিশ্বাসের যথার্থ উত্তরাধিকারী। সে সমস্ত মানুষকে নিজের সঙ্গে নিয়ে চলতে চেয়েছে। সে রাজনৈতিক নেতা হতে চায়নি। সে একজন নতুন entrepreneur, সে দেশসেবক নয়। তাই সে মাস্টারকে বলে,–

"চাকরি করিনি, একথা ঠিক নয় স্যার। পাশ করার পর বেশ কিছুদিন চাকরি খুঁজেছি। করবার মত উপযুক্ত চাকরি পাই নি। আর আমি ঠিক গ্রাম উন্নয়নের কাজ করছি না স্যার। গ্রামাঞ্চলে যে সব কাজে পয়সা আছে, সেই সব কাজ আপনাদের কাছ থেকে শেখা বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে শুরু করেছি। যদি সফল হই অনেক মানুষ উপকৃত হবে। আমারও রোজগার হবে। স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার মতো তো পারিবারিক অবস্থা আমার নয় স্যার।'' [৪৪]

এই কাজ, এই চেষ্টা করতে গিয়ে সে তার গোষ্ঠীর এবং গোষ্ঠীর বাইরের বেশ কিছু মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে নিয়েছে। কিন্তু সরকারি লালফিতার বাঁধন যে কীভাবে মহিমের মত মানুষের পরিশ্রমী কর্মকাণ্ডকেও অনেক সময় বিফল করে দিতে পারে– এর প্রমাণ রয়েছে 'মেঘের নদী' উপন্যাসে। মহিম তার সমস্যা নিয়ে প্রত্যেকটা ব্যাঙ্ক এ গেছে। ব্যাঙ্ক এর নিয়ম মতে মাছ মারার সময় হল ফাল্গুন মাস, তাই প্রবল খরায় জ্যৈষ্ঠ মাসেই জলের অভাবে মাছ মরতে শুরু করলেও মাছ তুলে বিক্রি করা চলবে না। এদিকে মহিমের টাকা বাকি পড়ে আছে ব্যবসাদারদের কাছে, তাকেও টাকা দিতে হবে অনেকের। এমন অবস্থায় বাস্তবের সঙ্গে একেবারে সম্পর্কহীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার চাপে মহিম হারিয়ে ফেলছে তার আত্মবিশ্বাস। উৎপাদনের শৃঙ্খলায় ক্রমশই ঘুন ধরছে যথার্থ ব্যবস্থাপনার অভাবে। মহিম তার শ্রমিকদের টাকা দিতে পারছে না, ব্যবসাদাররা তার পাওয়া টাকা দিচ্ছে না, অন্যদিকে ব্যাঙ্ক এর কিস্তি সে নিজেই দিতে পারছে না। চাপের মধ্যে আছে মহিম। এই চাপটা সৃষ্টি হয়েছে মূলত যথার্থ পরিকল্পনার অভাবে। উপন্যাসের মিটিং টা এখানে খুব জরুরি। লেখক প্রথমেই বলছেন যে 'সভা না বলে মিটিং বলা ভালো'। সভার মধ্যে একটা বড় ব্যাপার থাকে অর্থাৎ সভা প্রচুর মানুষের অংশ গ্রহণের ব্যাপার থাকে। আর মিটিং মুষ্ঠিমেয় কিছু মানুষের যান্ত্রিক উপস্থিতি ও ততোধিক যান্ত্রিক অ্যাজেণ্ডার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

মূলত কৃষক জীবনের সমস্যা সংকট, পরিকল্পনাবিহীন উন্নয়ন এবং এই পরিকল্পনাবিহীন উন্নয়নের ফলে বিভিন্ন কাজকর্ম গ্রামাঞ্চলে কীভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এর বর্ণনা রয়েছে উপন্যাসটিতে। জনজীবনের সঙ্গে একেবারেই সম্পর্কহীন রাজনৈতিক কর্তাব্যক্তিরা কীভাবে কাগজেপত্রে উন্নয়ন করে নিচ্ছেন এবং যার ফলে মহিমের মত কর্মদ্যোমী মানুষের কর্মযজ্ঞও বিফলে যাচ্ছে– শোষণের মধ্যে পড়ে মহিমের মত উদ্যমী মানুষ, শিক্ষিত ছেলেও চাপ সামলাতে পারছে না– উপন্যাসটির এটি একটি প্রধান বিষয়। আর এই বিষয়টির উপন্যাসে দাঁড় করানোর ক্ষেত্রে একটি সমস্যার দিক রূপে দেখা দিয়েছে

যৌনতা। এই যৌনতা এসেছে একটি ধর্ষণের ঘটনা, একটি পরিস্থিতিগত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। এই ঘটনাটির বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক বলছেন কীভাবে বেদনার্ত তন্দ্রাচ্ছন্ন মহিমের খুলে রাখা সার্টের পকেট থেকে টাকা চুরি করার লোভে ঘরে ঢোকে পোলিয়াদের মেয়ে উত্তরা, যে মহিমের খামার বাড়িরই এক ঠিকে ঝি বা কর্মচারী। টাকাটা নিতে সে সংকোচ করছে, ভয় পাচ্ছে,- আর এই অবসরেই জেগে গেছে মহিম। জেগে সে চোর ধরেছে। চোর ধরতে গিয়ে সামান্য বিধ্বস্ত হয়েছে উত্তরার পোশাক। আর এর পরই ঘটছে মহিমের কর্তৃক উত্তরাকে ধর্ষণের ঘটনা। এই ঘটনাকে উপন্যাসের প্রায় প্রধান ঘটনা রূপে দেখাছেন লেখক। এটা কি একেবারেই উদ্দেশ্যহীনভাবে?

অভিজিৎ সেনের বিভিন্ন রচনায় দেখা গেছে যে সমস্যাকে একটি অন্যমাত্রা দেওয়ার জন্য লেখক ব্যবহার করেছেন যৌনতাকে। যৌনতা, যৌনদৃশ্যের বর্ণনা এগুলির বর্ণনায় লেখক ইঙ্গিতে বিশ্বাসী নন, বিবরণে বিশ্বাসী। অথচ বিবরণের মধ্যে এমন একধরণের ভাষিক সংযম থাকে যে দীর্ঘ বর্ণনা সত্ত্বেও তা পর্নগ্রাফির স্তরে পৌঁছায় না। এও লেখকের একটা রচনার কৌশল। এই কাম-যৌনতা- এসবকে এতটা বর্ণনা না করলেও লেখকের উপন্যাসের শিল্পসিদ্ধি ঘটত বলে আমার বিশ্বাস করি। তবে যৌনতার এই অতিকথিত প্রসঙ্গ যে লেখকের রচনার দূর্বলতা – তাও বলা যায় না। কেননা তা কখনই দৃষ্টিকটু হয়ে ওঠে না।

অভিজিৎ সেন মহিমকে ব্যক্তিচরিত্র হিসাবে গড়ে তোলার প্রয়োজনে, মহিম যে দেবতা নয় - একথা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে তুলার প্রয়োজনে, মহিমেরও যে আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতই চাহিদা রয়েছে তা দেখানোর জন্য মহিমের এই কাজটিকে একধরনের যুক্তিগ্রাহ্যতা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। লেখক এক অদ্ভুত যুক্তি দিয়েছেন এখানে। তিনি বলছেন মহিমের সারা জীবন ধরে নিম্নশ্রেণীর মানুষ হয়ে থাকার যন্ত্রণার কথা-

“সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে তার প্রতিশোধের আকাঙ্খা সারা জীবন ধরে বাঙালি উচ্চবর্ণের কাছ থেকে পাওয়া তার সূক্ষ্ম ও স্থূল ঘৃণা, স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যন্ত

দীর্ঘ যাত্রাপথে সংরক্ষণ সুবিধার জন্য পাওয়া শ্লেষ, অপমান, ক্রোধ বিগত তিনমাসের যৌন অবদমন এবং সর্বোপরি এই ক্রমবর্ধমান খরা ও উজ্জীবিত দাবদাহ তার শরীর ও মনে এমন এক বিচিত্র আলকেমি সৃষ্টি করল যা তার জাগ্রত চেতনাকে, তার আত্মশাসনকে এবং দেবেন বিশ্বাসকে পর্যুদস্ত করে ফেলল। তার নিজেকে মনে হল স্বেচ্ছাচারের আধিকার অর্জন করা এক প্রবল ব্যাভিচারি'' [৪৫]

এখানে যেন উপন্যাসের কথক তাঁর নায়ক রক্ষা করার জন্যই এমন যুক্তিজাল রচনা করেছেন। এখানে আরেকটি প্রসঙ্গের উল্লেখ আসতে পারে। মহিমের মত কাজসর্বস্ব মানুষের নেপালী মহিলার বাড়িতে যাওয়া কেন? এই ঘটনাটি আসলে পরবর্তী ঘটনাটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে গড়ে তোলার জন্যই উপন্যাসে এসেছে। এই আধা দেবতা, আধা অবতার মহিমও যে রক্তমাংসের দোষে গুণে মিলে একটি মানুষ তাই যেন লেখক দেখাতে চাইছেন। তাই সে বন্ধু গুইন্দুর সাথে উপস্থিত হয় সেই নেপালী মহিলার ঘরে। সেই মহিলার দিকে আকৃষ্ট হয়ে মহিম যখন তার কাছে যেতে অগ্রসর হয়, তখন সে আয়নার দেখতে পায় দেবেন বিশ্বাসের প্রতিচ্ছবি। এ শুধুই দেবেন বিশ্বাসের প্রতিচ্ছবি নয়, এ দেবেন বিশ্বাসের শিক্ষা, সংস্কার, দায়িত্ববোধ। দেবেন বিশ্বাস তাকে শিখিয়েছেন, সমাজ নেতাকে সাধারণ মানুষের মত চললে হবে না, তাই যখনই বাঁধাধরা নিয়মের বাইরে একটু উত্তেজনা, একটু অবৈধতার দিকে মানুষের প্রাণের স্বাভাবিক ঝোঁকবশত অগ্রসর হয়েছে মহিম, তখনই তার সামনে তর্জনী তুলে হাজির হয়েছেন দেবেন বিশ্বাস। এ তারই বিবেক দংশনের প্রতিচ্ছবি।

লেখক মহিম চরিত্র রচনার ক্ষেত্রে অনুপুঙ্খ বর্ণনার মধ্য দিয়ে বারবার এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, সে কোনো ইউটোপিয়া বা অলীক-অবাস্তব-স্বপ্নময় চরিত্র নয়, - সে মানুষ। মহিম চিত্ত দুর্বল এক যুবক, যার দুর্বলতার একটি বিশেষ দিক আছে! নারীর স্তনের প্রতি তার প্রবল আগ্রহ সারাজীবনের, তার উপর পত্নীর গর্ভাবস্থায় তার সাথে স্বাভাবিক দূরত্ব, সারাদিনের পরিশ্রম, বিভ্রান্ত অবস্থা, তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় তার স্বপ্নের বর্ণনা- এসমস্ত

কিছুর মধ্যেই রয়েছে যৌনতার অনুষঙ্গ। সব মিলিয়ে দেবেন বিশ্বাস পরাভূত হয়েছেন। এখানে প্রশ্ন জাগে তাহলে কি অভিজিৎ সেনের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র এই ধর্ষণের ঘটনাটির সমর্থন করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ? উপন্যাসটি সচেতন পাঠকের দৃষ্টিতে পড়লে দেখা যায়, গোটা ব্যাপারটি অভিজিৎ ব্যবহার করেছেন অন্য একটি উদ্দেশ্যে,– অন্য একটি ব্যাপার উপন্যাসে নিয়ে আসার জন্য।

প্রথমত এই ঘটনাটি দরকার একটি সমস্যাকে চিহ্নিত করার জন্য। উত্তরা ধর্ষিত না হয়ে অন্য কোনো মেয়ে ধর্ষিত হলে ব্যাপারটা এমন দাঁড়াত না। মেয়েটি পোলিয়াদের হওয়া দরকার, মেয়েটি রাজবংশীদের হওয়া দরকার-, কেননা উত্তরবঙ্গের কামতাপুরি আন্দোলনকে আখ্যানের ক্রনোটপে তুলে আনতে হবে, - চেষ্টা করতে হবে তার যথার্থ স্বরূপ সন্ধানের। এই দায় সমাজ-সচেতন লেখক অভিজিৎ সেনের। সারা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে গত ত্রিশ - চল্লিশ বছরের প্রধান সমস্যা হল ethnicity driven identity বা অস্তিত্বের সন্ধান। প্রত্যেকটা ছোট ছোট জনগোষ্ঠী তার অস্তিত্বকে পুনরুদ্ধার চাইছে, এবং যখন দেখছে যে তার সংস্কৃতি, তার স্বাতন্ত্র্য, তার ভাষা, তার আত্ম পরিচয় কোনোও না কোনোও ভাবে আক্রান্ত হচ্ছে প্রতিবেশী ক্ষমতাশালী শক্তির দ্বারা,-তখন তারা স্বতন্ত্র রাজ্য চাইছে, কখনও চাইছে গোটা রাষ্ট্রও। ডিমাসা, মার, রিয়াং, চাকমা- সকলেই অর্থাৎ উত্তর-পূর্বভারতের বিচিত্র জনগোষ্ঠী আত্ম পরিচয় পুনরুদ্ধারের জন্য সশস্ত্র আন্দোলনের দিকে যাচ্ছে, যাচ্ছে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের দিকে। এই আন্দোলনের প্রক্রিয়া, এই জাতিগঠনের প্রক্রিয়া Post colonial জাতি গঠনের প্রক্রিয়া রূপে চিহ্নিত হতে পারে। এই উত্তর পূর্ব ভারতের জাতি গঠনের প্রক্রিয়ায় কোচ বা রাজবংশীরাও নিজস্ব অভিজ্ঞান বা আত্মপরিচয়ের সন্ধানে ব্রতী হয়েছেন। আক্রাসু আমাদের পশ্চিম আসামের এক প্রবল শক্তিমান ছাত্র সংগঠন। এই সংগঠনই পশ্চিমবঙ্গে কামতাপুরি নামে খ্যাত। কোকড়াঝার অঞ্চল সহ গোয়ালপাড়ার একটা অংশ নিয়ে, বাংলাদেশের রংপুর থেকে বিহারের পূর্ণিয়া পর্যন্ত এবং গোটা উত্তরবঙ্গ জুড়ে ব্যাপক হারে রাজবংশীদের বাস। এই রাজবংশীরা আসামের বিভিন্ন

অঞ্চলে অসমিয়া আবার শিলিগুড়িতে-কোচবিহারে-দিনাজপুরে- মালদাতে-নিজের বাড়িতে, স্বভূমিতে তারা বাঙালি পরিচয়ে বাস করে। অথচ তারা মোঙ্গলয়েড, আর বাঙালি হচ্ছে আস্ট্রিক আর্য মিশ্রিত জনগোষ্ঠী। এই কামতাপুরি আন্দোলনটিকে এক অন্য মাত্রা দেবার জন্য ঘটনাটিকে তুলে আনা হয়েছে উপন্যাসে। প্রথমে এই পোলিয়াদের মেয়ের ধর্ষণের বর্ণনা, তারপর ব্রজেন বৃত্তান্ত। কত কত বাঙালি মানুষ ইউনিয়নের নামে কাজ করে না, কিন্তু বিচার হলে চাকরি যায় কেবল রাজবংশী ব্রজেন রায়ের। তিনি দেখাচ্ছেন রাজবংশীরাও নির্যাতিত। অভিজিৎ তাই বলে কোনো জাতি-গোষ্ঠীর বিচ্ছিন্নতাকে সমর্থন করেন না, কিন্তু এই আন্দোলনের প্রেক্ষিতটি রচনায় তুলে ধরে তিনি সম্ভবত দেখাতে চাইছেন যে স্পর্শকাতর সময়ে একটি সাধারণ ঘটনা, একজন পুরুষের দ্বারা নারী নির্যাতন মাত্র হয়ে থাকেনা, বরং হয়ে যায় বাঙালি পুরুষের দ্বারা রাজবংশী নারীর উপর আক্রমণ। রাজবংশী সমাজ তাই বন্ধ ডাকে, রাস্তা অবরোধ করে, বিদ্রোহ করে। এই ভাবে গত বিশ বৎসর ধরে চলতে থাকা রাজবংশীদের স্বতন্ত্র কোচ রাজ্যের জন্য আন্দোলনের ছবি উঠে আসে উপন্যাসে। এই বিষয়টির উপন্যাসে স্থান পাওয়ায় এটি কেবল কৃষক জীবন ভিত্তিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে নি, পেয়েছে নতুন মাত্রা। উপন্যাসে যুক্ত হয়েছে বাস্তবতার আরেকটি তল। আর সেই সাথে উপন্যাসের পরাপাঠে আরেকটি বিষয় উঠে এসেছে। যে মেয়েটি ধর্ষিত হল, সে মহিমের পৌরুষে মুগ্ধ হয়েছিল, কিন্তু মহিম যখন তাকে সমস্ত শক্তি দিয়ে চেপে ধরলো, তখন মেয়েটির মুখ থেকে একটি আর্ত চিৎকার (মহিমের যা 'শীৎকার' বলে মনে হয়েছিল) ব্যতীত আর কোন আওয়াজই বেরোল না, এবং তার পর থেকে গোটা উপন্যাস জুড়ে মেয়েটি বোবা হয়েই থাকল। উপন্যাসের পরাপাঠে উঠে আসলো নিম্নবর্গের ধর্ষিতা মেয়ের অভিযোগ শোনবার কান আমাদের সভ্য রাষ্ট্রের আজও তৈরি হয়নি। উত্তরাকে কেন্দ্রে রেখে আখ্যানটির একটি নারীচেতনাবাদী ভাষ্য রচনা করাও সম্ভব। অন্যদিকে মহিমের স্ত্রী মণিমালার প্রসঙ্গটিও এখানে উঠে আসতে পারে, উত্তরা অশিক্ষিত, আদিবাসী মেয়ে। কিন্তু মণিমালা তো শিক্ষিত, রাজ্যের শিক্ষক নিযুক্তির পরিক্ষার

সে উত্তীর্ণ হয়েছে ভালভাবেই। ধর্ষক, বিশ্বাসঘাতক স্বামীর সাথে আর থাকতে পারবে না বলে স্কুলে চাকরি নিয়ে দূরে কোথাও চলে যাবার কথাও বলে মনিমালা। কিন্তু পরমুহূর্তেই সুজাতা দিদিমনির মুখে, *"তা ছাড়া তোদের ছেলে আছে। তার কাছে ভবিষ্যতে জবাবদিহি করতে হতে পারে।"* [৪৬]

এই সামান্য কথায় সে দমে যায় কেন। নারীর এই অবদমন আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বহুমুখী শোষণেরই ফল।

যাইহোক, মহিমের কেস নিস্পত্তি হয় সম্ভবত দশ-পনেরো হাজার টাকায়। কিন্তু একথা জানা বাকি থেকে যায় যে, উত্তরা কি আদৌ ভয় পেয়েছিল, সে আদৌ কী চেয়েছিল? আমাদের সমাজে প্রান্তিক নারীর অবস্থান কোথায়? - তাঁকে নিয়ে রাজনীতি হয়, রাস্তা অবরোধ হয়, তাকে কেন্দ্র করেই চতুর্থ বর্গের কর্মচারী সমাজের নেতা হয়ে ওঠে, তারে বিশাল বক্তৃতা হয়, - কিন্তু মেয়েটির আওয়াজ আর শোনা যায় না, মেয়েটির মুখ আর দেখা যায় না।

নানান রকমের বার্তার মধ্যে দিয়ে শোষণমূলক সমাজের নানা অনাচারকে অনাবৃত করার চেষ্টা করেছেন লেখক তাঁর এই 'মেঘের নদী' উপন্যাসে। উপন্যাস ছোট্ট পরিসরে বাস্তবতার একটা বহুমাত্রিক ছবি হয়ে উঠেছে। এখানেই অভিজিতের সার্থকতা। অভিজিৎ একটা গল্পে কেবল নিটোল গল্পই বলেন না, কেননা শুধুমাত্র কাহিনি গ্রন্থনা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তাই সেই গল্পটি কার্যকারণ সূত্রে গেঁথে তাঁর একটা নির্দিষ্ট পরিণতি দানও তাঁর দায় নয়। তাই কাহিনির শেষে মহিম - মনিমালার কি হল তা জানা যায় না, যদিও বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে- অর্থাৎ পোলিয়া মেয়েটি উপযুক্ত বিচার পায় না, - এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু গল্পটি শেষ করার দায়িত্ব লেখক নেন না।

আমরা দেখছি যে অভিজিৎ কেবল কাহিনিই বলছেন না, বরং কাহিনির অন্তর্বয়নে দেশ - কালের যথার্থ বাস্তবতাকেই প্রতিবিম্বিত করছেন। লেখক তাঁর রচনায় সময়ের অন্তর্বৃত বাস্তবতার সকল মাত্রাকেই অনাবৃত করার চেষ্টা করেন। অত্যন্ত সময় সচেতন

লেখক তিনি। তাঁর রচনার উপজীব্য বিষয় হল মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ। এই বিষয়টাকেই আমরা বোঝার চেষ্টা করছি আমাদের গবেষণার মধ্য দিয়ে। বাস্তবতা সম্বন্ধে লেখকের নিজস্ব কিছু বক্তব্য আছে। বাস্তব কীভাবে নির্মিত হয়, তথাকথিত আধুনিক সাহিত্যিকেরা বাস্তবকে কীভাবে নির্মাণ করেন ঘটনা বয়ানে, - তথাকথিত বঙ্গীয় আধুনিক বাস্তবতার ধারণাকেই যেন তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর কাছে বাস্তব মানে অজস্র খুঁটিনাটি ঘটনার সমাহার। শ্রেণি ভিত্তিক সমাজে এক নতুন বাস্তবতার প্রচার করেন অভিজিৎ সেন। আর তাঁর এই বাস্তবসম্বন্ধীয় ভাবনার সার্থক উদাহরণ হল তাঁর 'মেঘের নদী' উপন্যাস।

যে তিনটি রচনা আমরা বর্তমান অধ্যায়ের জন্য বেছে নিয়েছি, এই উপন্যাসগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে স্বাধীন দেশে ভারতীয় কৃষকের বাস্তব অবস্থা কুটে উঠেছে। অভিজিৎ সেন এই অবদমিত, অক্লান্ত শ্রেণির মুক্তি প্রত্যাশী। সে মুক্তি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মানুষ পরিচয় অর্জনের অভীপ্সার সঙ্গে যুক্ত। অন্যান্য লেখায়ও, তাঁর গল্পের ভুবনেও অভিজিৎ এদের কথাই লেখেন। ব্যক্তিগত নিমির্তি নেই তাঁর লেখার ভুবনে, কৃষককে সব পেয়েছির দেশে পৌঁছে দেন না, বরং রাষ্ট্রে সমাজে রাজনৈতিক চিন্তায় উন্নয়ন কর্মসূচিতে কেবলই যে ভূমিলগ্ন কৃষককে নিরাকৃত করবার আয়োজন, তাকেই লেখক অনাবৃত করেন। এখানেই অভিজিতের অনন্যতা।

*****

উল্লেখপঞ্জী ঃ–

১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঃ 'রাশিয়ার চিঠি' (বরীন্দ্র রচনাবলী (বিংশ খণ্ড) বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা ১৩৫২, পৃ- ২৭৩

২। চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঃ 'দেশের শ্রীবৃদ্ধি', 'বঙ্গদেশে কৃষক', বিবিধ প্রবন্ধ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ৮৫।

৩। ঐ, পৃষ্ঠা- ৮৫।

৪। দাশ, চিত্তরঞ্জন ঃ পশ্চিবঙ্গে ভূমি সংস্থার ও ভারতের কৃষি অর্থনীতি, এম.এল.আর.সি., কলকাতা, মে, ২০০৯, পৃষ্ঠা- ১৯১।

৫। দাশ, চিত্তরঞ্জন ঃ উপস্থাপনা পশ্চিবঙ্গে ভূমি সংস্থার ও ভারতের কৃষি অর্থনীতি, এম.এল.আর.সি., কলকাতা, মে, ২০০৯, পৃষ্ঠা-২)

৬। সেন, অভিজিৎ ঃ বর্গক্ষেত্র - 'দশটি উপন্যাস' প্রতিভাস, ২০১২, পৃষ্ঠা- ৭৮৭।

৭। ঐ, পৃষ্ঠা-৭৯৬।

৮। ঐ, পৃষ্ঠা- ৭৮৩।

৯। ভট্টাচার্য, তপোধীর ঃ 'অভিজিৎ সেন-এর উপন্যাসিক সন্দর্ভ', ''বাংলা উপন্যাস বীক্ষা ও অন্বীক্ষা''– সুবল সামন্ত সম্পাদিত, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা– ৯৪।

১০। সেন, অভিজিৎ ঃ বর্গক্ষেত্র - 'দশটি উপন্যাস' প্রতিভাস, ২০১২, পৃষ্ঠা- ৭৮৭।

১১। ঐ, পৃষ্ঠা- ৮০২।

১২। বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম ঃ 'এ সময়, বাস্তব ঃ সমগ্র রূপ', ক্রোড়পত্র, নিসর্গ ৯ম বর্ষ, ১ সংখ্যা পৃষ্ঠা-১৯৮।

১৩। সেন, অভিজিৎ ঃ বর্গক্ষেত্র - 'দশটি উপন্যাস' প্রতিভাস, ২০১২, পৃষ্ঠা-৭৯৬।

১৪। ঐ, পৃষ্ঠা- ৮০৩।

১৫। ঐ, পৃষ্ঠা- ৮১০।

১৬। ঐ, পৃষ্ঠা- ৮১৩।

১৭। ঐ, পৃষ্ঠা- ৮১৪।

১৮। ঐ, পৃষ্ঠা- ৮১৩।

১৯। ঐ, পৃষ্ঠা- ৮১৪।

২০। ঐ, পৃষ্ঠা- ৮১৪।

২১। ঐ, পৃষ্ঠা- ৮১৪

২২। ঐ, পৃষ্ঠা- ৮০৩।

২৩। ঐ, পৃষ্ঠা- ৭৯৩।

২৪। ঐ, পৃষ্ঠা- ৭৮৮।

২৫। ঐ, পৃষ্ঠা- ৮০৬।

২৬। ভট্টাচার্য, তপোধীর ঃ 'ভগীরথ মিশ্রের গল্পবীক্ষা- এবং মুশায়েরা' ৭ম এবং ২৪তম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০০০, অক্টোবর-ডিসেম্বর, পৃষ্ঠা-৮৯।

২৭। সেন, অভিজিৎ ঃ 'আমার দুঃখী উপন্যাসের কয়েকটি', কোরক - প্রাক্ শারদ সংখ্যা ১৪১৫, পৃষ্ঠা-৯৮

২৮। সেন, অভিজিৎ ঃ 'হলুদ রঙের সূর্য', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা বইমেলা ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১১।

২৯। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৭।

৩০। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৯।

৩১। ঐ, পৃষ্ঠা- ১১৯।

৩২। ঐ, পৃষ্ঠা– ২৩।

৩৩। ঐ, পৃষ্ঠা– ৩৪।

৩৪। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৫।

৩৫। ঐ, পৃষ্ঠা- ৮২।

৩৬। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩২।

৩৭। ঐ, পৃষ্ঠা- ১২৫।

৩৮। ঐ, পৃষ্ঠা- ৯১।

৩৯। ঐ, পৃষ্ঠা- ১১৬।

৪০। ঐ, পৃষ্ঠা- ১১৬।

৪১। ঐ, পৃষ্ঠা- ১২৭।

৪২। সেন, অভিজিৎ ঃ 'মেঘের নদী' দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারি, ২০০৫, পৃষ্ঠা- ৬৭, ৬৮।

৪৩। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৭।

৪৪। ঐ, পৃষ্ঠা- ৬৭।

৪৫। ঐ, পৃষ্ঠা- ৭৪।

৪৬। ঐ, পৃষ্ঠা- ৮৬।

*****